সাধককবি রামপ্রসাদ

প্রণবকুমার দাশগুপ্ত

৮ এ, টেমার লেন • কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ :
মহালয়া, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস,
পূর্ণ প্রকাশন,
৮ এ, টেমার লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

যিনি আমার চলমান জীবনে একমাত্র উৎসাহীদাত্রী,
যিনি মহামায়া মহাশক্তির অংশ সমদ্ভূতা ;
সেই আমার 'দেবী'কে—

SADHAK KOVI RAMPRASHAD

(A life)

by **Pranab Kumar Dasgupta**

এই লেখকের :

প্রকৃতি মা শ্রীশ্রীসারদামণি

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীচৈতন্যদেব ১ম খণ্ড/২য় খণ্ড

সাধক কমলাকান্ত

তারাপীঠ ভৈরব শ্রীবামাক্ষ্যাপা

ছোটদের জন্য :

নীল ঘোড়া আসোয়ার (ঐতিহাসিক গল্প)

স্বাধীন শেষ সূর্য (ঐ)

করুণাময়ী ৺তারা ব্রহ্মময়ীর অশেষ কৃপায় 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' প্রকাশিত হ'লো। সাধক কবির জীবনাখ্যানখানির তত্ত্ব ও তথ্য সবকিছুই, জগৎমাতার কাছ থেকে পাওয়া। 'মা' যা বলেছেন তাই কেবল মাত্র ভাষায় প্রকাশ করেছি। কেবল মাত্র প্রকাশ। আর আজু গোঁসাইয়ের গান ও তত্ত্ব উদ্বোধন প্রকাশিত স্বামী বাম দেবানন্দ-এর 'সাধক রামপ্রসাদ' থেকে গ্রহণ করেছি। সেজন্য তাঁর কাছে দীন লিপিকার চির কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে একথা বলি, 'সাধক কবির' জীবনাখ্যানখানি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগলে, আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো। ইতি—

প্রণবকুমার দাশগুপ্ত

সাধককবি (কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেনের বংশ তালিকা
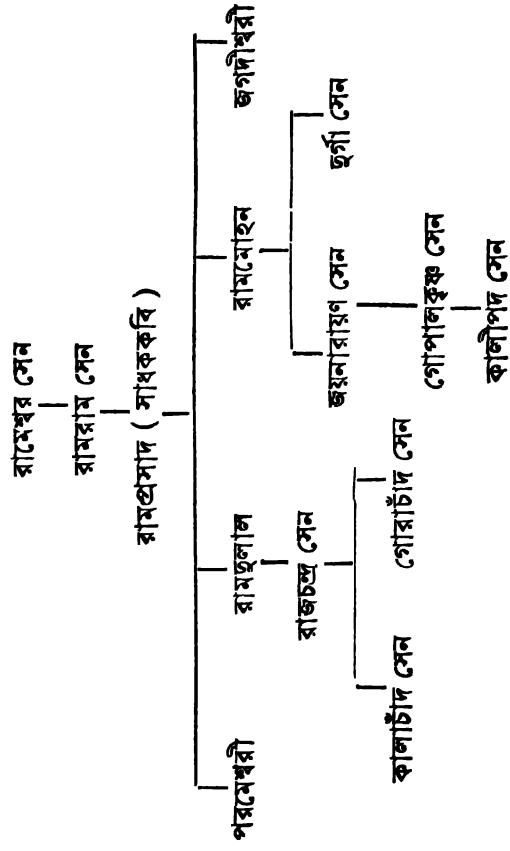
না হুজুর এমন লোককে দিয়ে কোন কাজ চলবে না।

উর্দ্ধতন কর্মচারী এসে আবেদন জানালেন জমিদার কুলতিলক দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়কে। আর্জি পেশ করলেন—শুধু আর্জি পেশ করা নয়, সরাসরি আবেদন জানালেন নবাগত কর্মচারীর বিরুদ্ধে।

আবেদন জানালেন, এই নবাগত কর্মচারীটির চাকুরী খতম করে দেবার জন্য। বার বার আর্জি পেশ করতে লাগলেন উর্দ্ধতন কর্মচারীটি নবাগত কর্মচারীটির বিরুদ্ধে। বললেন, সত্যি বলছি হুজুর! আপনি সবাইকে জিগ্‌গেস করলে জানতে পারবেন আমি মিথ্যা বলছি কি সত্যি বলছি। রামপ্রসাদ হুজুরের সমস্ত হিসেবের খাতায় কি সব হিজি-বিজি লিখে, সমস্ত হিসেবের খাতাটাই একেবারে বরবাদ করে দিয়েছে।

হুজুর! হাজার বার বারণ করা সত্ত্বেও রামপ্রসাদ কারো কথায় কান দেয় না, কারো কথা শোনার অপেক্ষা রাখে না। নিজের খেয়ালেই হিসেবের খাতায় কি সব হিজি-বিজি লিখে যায়। এমন এক বদ্ধ পাগলকে দিয়ে কাজ করানো নয়—হুজুরের সমস্ত জমিদারীটাকে একেবারে রসাতলে পাঠাবার ব্যবস্থা করার সামিল হয়ে দাঁড়াবে!

উর্দ্ধতন কর্মচারীটির এক-তরফা আবেদনটি নীরবে শুনে গেলেন জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়। শুনে গেলেন স্বতঃ গাম্ভীর্যে। এবং তেমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না; আপনি কার কথা বলতে চাইছেন! তাছাড়া রামপ্রসাদ? রামপ্রসাদই বা আবার কে?

হুজুর! বিনীত স্বরে উর্দ্ধতন কর্মচারীটি উত্তর দিলেন,—হুজুর, এই সেদিন, আপনি যাকে সেরেস্তার কাজে বহাল করেছিলেন, আমি সেই লোকটির কথাই বলছিলাম হুজুর! তারই নাম

রামপ্রসাদ।—হুজুর, এই রামপ্রসাদ নিজের খেয়ালে নিজেই চলে; কারো কথা কানে নেয় না।—আপনার হিসেবের খাতায় কি সব হিজি বিজি লিখে লিখে ভর্ত্তি করে ফেলেছে,—তার যেমন মাথাও নেই, তেমনি মুণ্ডও নেই।

হুজুর! আপনি যদি একবার পরখ করে দেখেন, তা' হলে সবই বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারবেন, আমি মিথ্যা বলছি না সত্যি বলছি।

বার বার অনুরোধ জানান উর্দ্ধতন কর্মচারীটি—জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়কে। যেন একজন অসহায় নিম্নতম কর্মচারীর কর্মটিকে খতম করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

আশ্চর্য হয়ে যান কুলতিলক জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় এবং আশ্চর্য হয়ে নিজের মনে ভাববার চেষ্টা করলেন—কেন? কেন এমন হয়? আব কিবা অন্যায় করেছে নবাগত কর্মচারী রামপ্রসাদ? ভাবলেন আবার মিত্র মশায়, সত্যিই কি তাই?

উর্দ্ধতন কর্মচারীটি আজ বার বার তাঁর কাছে যে আবেদন জানাচ্ছে, তা কি সত্যি? নূতন করে ভাবতে হয় জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়কে। অথচ তাঁর এত গোমস্তা কেরানীদের মধ্যে একটি পাগলাটে কেরানী, তাঁরই অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, তাঁরই হিসেবের খাতাটাকে একেবারে বরবাদ করে দিয়েছে। এ কি কখনো সম্ভব? কিন্তু নিজের বিবেকে কিসের একটা দংশন অনুভব করেন দুর্গাচরণ মিত্র মশায়। তাই আবার নূতন করে ভাবলেন;—না! সামান্য একজন কর্মচারীর কথার উপর নির্ভর করে, আর একজন কর্মচারীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে পারবেন না। কোন মতেই না। তবে হাঁ,—এই নিম্নতম কর্মচারীটি যদি সত্যি সত্যি কোন গুরুতর অন্যায় করে থাকে, তবে তার কৈফিয়ৎ তলব করতে হবে বৈকি! যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে হবে। তবে, আবেদনকারী উর্দ্ধতন কর্মচারীটির মারফৎ দিয়ে নয়। নিজের হাতেই।

সুবিবেচক জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়, নিজের মনে কথাগুলি ভেবে নিয়ে মনে মনে একটা সুবিবেচনা ঠিক করে নিলেন। তারপর তেমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে ঊর্দ্ধতন কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে বললেন, হিসেবের খাতাখানা কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?

হাঁ হুজুর! তা' আমি সঙ্গে করেই এনেছি। হুজুর যদি— ঊর্দ্ধতন কর্মচারীটির কথা সমাপ্ত করতে না দিয়ে জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় তেমনি গাম্ভীর্যকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে বললেন, কৈ? দেখি খাতাখানা।

ঃ এই নিন হুজুর! বলেই ঊর্দ্ধতন কর্মচারীটি ত্রস্ত ও তড়িৎ হস্তে হিসেবের খাতাখানা এগিয়ে দেন জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়ের দিকে। খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে তিনি ভীতিপূর্ণ চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকেন দুর্গাচরণ মিত্র মশায়ের কোন আদেশের অপেক্ষায়।

মিত্র মশায় ঊর্দ্ধতন কর্মচারীটির হাত থেকে হিসেবের খাতা-খানা নিজের হাতে নিয়ে ঊর্দ্ধতন কর্মচারীটিকে বিদায় দিয়ে; একের পর এক খাতাখানার পাতা উল্‌টিয়ে যেতে লাগলেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ময়ে যেন তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। একি?—হিসেবের খাতায় হিসেবের শেষের দিকে এ সব কি লেখা রয়েছে?—হিসেবের পাকা খাতা রামপ্রসাদ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে!—সামান্য এক বেতন ভোগী কর্মচারীর এত বড় স্পর্দ্ধা!—মনে মনে ভাবলেন মিত্র মশায়।—শুধু ভাবা নয়, একটা অজানিত ক্রোধ এসে তাঁর মনের মধ্যে যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠতে থাকে। কিন্তু, এই অজানিত ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদম্য কৌতূহল অনুভব করতে থাকেন। আর সেই কৌতূহলের বশে মিত্র মশায় হিসাবের খাতায় হিসাবের শেষের লেখাগুলি পড়তে লাগলেন, এবং সেই হিসেবের শেষের লেখাগুলি পড়তে পড়তে আবার ভাবলেন;—একি!—এ'—

হিসেবের শেষে যেটুকু ফাঁকা স্থান পেয়েছে,—সেই ফাঁকা স্থানটুকু

পূরণ করেছে, রামপ্রসাদ সনাতন হিন্দু জাতির আরাধ্য দেব-দেবীর নাম লিখে। দুর্গা-কালী, তারা ব্রহ্মময়ীর নাম নয় শুধু,—ত্রিদিবের দেব মহাদেবেরও নাম বাদ দেয়নি রামপ্রসাদ। শুধু কি নামেই ক্ষান্ত হয়েছে রামপ্রসাদ? না! শুধু নামেই ক্ষান্ত হয়নি সে।

তাঁদের সকলেরই নাম গানে, হিসেবের খাতার শূন্য স্থানটুকুকে পূর্ণ করে তুলেছে। হায় রে—

আমি এমন অধম যে, আগে বিচার না করেই মনের মধ্যে ক্রোধকে স্থান দিতে যাচ্ছিলাম। নিজের মনেই ভাবলেন কুল-তিলক জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়, পাগল,—পাগল! নিশ্চয় পাগল না হয়ে যায় না। ঊর্দ্ধতন কর্মচারীটি যে বলেছে 'আস্ত পাগল'; তাত বটেই। নিজের মনেই হাসলেন মিত্র মশায়। এবং নিজের মনেই হাসতে হাসতে রামপ্রসাদের লেখা মাতৃনাম গানগুলি পড়তে লাগলেন।

পড়তে পড়তে হঠাৎ একটি মাতৃনাম গান পড়েই, তাঁকে যেন দাঁড়িয়ে পড়তে হলো, কেন না জগন্মাতার এক ভক্ত সন্তান,—তাঁর অন্তরের সমস্ত বেদনাটুকু ঢেলে নিয়ে মিনতী জানাচ্ছে মায়ের চরণ তলে—'আমায় দাও মা তবিলদারী।'

মিত্র মশায় গানটি যতই পড়েন, ততই যেন বিস্ময়াভূত হয়ে পড়েন। আর ভাবেন,—'এমন পাগল না হলে, কি এমন কথা কেউ লিখতে পারে? যে মায়ের নামে পাগল, একমাত্র সে-ই এমনি মুক্তস্বরে গাইতে পারে।

"আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী।"

যতবার গানটি পড়েন, ততই যেন তাঁর মনটি একটা অজানিত ভাব এসে পরিপূর্ণ করে তোলে। সত্যই ত, পাগল না হলে এমন জগন্মাতার নাম গান লিখতে পারে। যে একমাত্র মায়ের নামে পাগল,—মায়ের গানে পাগল, একমাত্র সেই মায়ের চরণ অধিকারী হ'তে পারেন। ভাবেন জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় এবং ভাবতে-

ভাবতে হঠাৎ একসময় ডাক দেন, ওরে কে আছিস। একবার নায়েবকে ডেকে দেত।

মিত্র মশায়ের আহ্বানে একজন ভৃত্য এসে দাঁড়াল। মিত্র মশায় বললেন, নায়েব মশায়কে ডেকে দে। বল, তাকে আমি ডাকছি।

যে আজ্ঞে, বলেই ভৃত্যটি চলে যায়। এবং ভৃত্যটি চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই উর্দ্ধতন কর্মচারীটি এসে হাজির হয়। ভীত ও ত্রস্তস্বরে বললে, হুজুর আমায় ডাকছিলেন?

উর্দ্ধতন কর্মচারীটির কণ্ঠস্বরে জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর তেমনি-ভাবে কিছুক্ষণ তারই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, অবশেষে বললেন, তোমার অভিযোগ এই রামপ্রসাদের নামে। তাই না? বিনীতভাবে উর্দ্ধতন কর্মচারীটি বললে, আজ্ঞে হাঁ হুজুর।

—হুম্! তোমার এই অভিযোগটি কি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? পুনশ্চ গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়।

পূর্বের মত বিনীতভাবে উর্দ্ধতন কর্মচারীটি বললে,—হুজুর স্ব-চক্ষেই ত দেখলেন,—রামপ্রসাদ পাকা হিসেবের খাতাখানাকে কি ভাবে—

বাধা দিয়ে জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় বললেন,—তা' আমি দেখছি, কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য খাতায় রামপ্রসাদ কি লিখেছে তা পড়ে দেখেছ?

—হুজুর! তা আমি দেখেছি। কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কি যে লিখেছে, তা বুঝতে পারিনি। বিনীতভাবে উত্তর দেয় উর্দ্ধতন কর্মচারীটি।

—হুঁ! বেশ, তুমি রামপ্রসাদকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

—যে আজ্ঞে, বলেই উর্দ্ধতন কর্মচারীটি ত্রস্ত পদে জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়ের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচে। শুধু পালিয়ে

কাচা নয়—বালর হাড়কাঠ থেকে বালর পাঁঠা কোনক্রমে একবার যদি মুক্ত হ'তে পারে তবে যেমনটি ছুটে পালিয়ে বাঁচবার ব্যর্থ একটা চেষ্টা করে, তেমনিভাবে উর্দ্ধতন কর্মচারীটি জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়ের সামনে থেকে পালিয়ে যায়। এবং পালিয়ে সোজা রামপ্রসাদের সামনে এসে গম্ভীর স্বরে বললে, এই যে রামপ্রসাদ, হুজুর তোমায় তলব করেছেন। এখুনিই তাঁর সঙ্গে দেখা করগে! যাও, শিগ্‌গীর যাও।

তখন রামপ্রসাদ ভাবের ঘোরে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। উর্দ্ধতন কর্মচারীটির কথাতে রামপ্রসাদ চমকিত হয়ে ওঠেন। চমকিত হয়ে বলেন, এঁ্যা। আমায়—আমায় হুজুর ডাক্‌ছেন? কিন্তু কেন?

—কেন ডাক্‌ছেন, তা হুজুরের কাছে গেলেই জান্‌তে পারবে, একটা অজানিত ক্রোধ ভরে উর্দ্ধতন কর্মচারী উত্তর দেয়। তারপর স্বগতঃভাবে বলে, হুম্! কেন ডাক্‌ছেন,—কি জন্য ডাক্‌ছেন, তাব সব কিছুই আগে কৈফিয়ৎ দাও!—হুম্! হুম্! বাবু যেন কিছুই জানেন না। যাওনা বাপু! গেলেই সব কিছু টের পাবে!

উর্দ্ধতন কর্মচারীর স্বগতোক্তি শুনে রামপ্রসাদ তাকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে আগ্রহী হলেন না। হবেনই বা কেন? যাঁর মন-প্রাণ একমাত্র অভয়ার অভয় পদে সঁপে দিয়েছেন—যাঁর মন-প্রাণ একমাত্র জগন্মাতার নামগানে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে সে কেন সামান্য থেকে সামান্যতম মানুষের ক্রোধ আর ভ্রূকুটির জন্য অপেক্ষা করবে? কেন না—

তিনি সামান্য থেকে সামান্যতম মানুষের ক্রোধ আর ভ্রূকুটির জন্য অপেক্ষা করেন না। রামপ্রসাদও অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই তিনি একটি বার মুখ তুলে উর্দ্ধতন কর্মচারীর মুখের দিকে তাকিয়ে জগন্মাতাব নাম স্মরণ করে, আত্মসমাহিতভাবে চল্‌লেন জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়ের কাছে।

* * * *

পাগল! পাগল—বদ্ধ পাগল! বলে রামপ্রসাদকে সকলেই

ভাবছে। কিন্তু জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় হিসেবের খাতা-খানাকে ভাল ভাবে পরখ করতে গিয়ে নিজেই যেন বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন। বিস্মিত হয়ে ভাবেন যে এমন মাতৃভক্ত যে মায়ের নামে আত্মহারা—তাঁকে যদি তাঁরই অধীনস্থ কর্মচারীরা রামপ্রসাদকে পাগল বলে ভাবে, ভাবুক। কিন্তু তিনি কখনো রামপ্রসাদকে পাগল বলে ভাবতে পারেন না। তাই মিত্র মশায় আবার নূতন করে ভাববার চেষ্টা করেন ;—মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ যদি পাগল হয়,—তবে এই ভবের হাটে কে না পাগল!—বিশ্বজননীর এই মায়ার সংসারে সকলেই ত কিছু না কিছুর জন্য পাগল হয়ে রয়েছে ;—কেউ বা সংসার, অর্থ, কাম, যশের জন্য পাগল হয়ে রয়েছে। আবার কেউ জগৎ সংসারে অর্থ-কাম যশকে পরিত্যাগ করে জগন্মাতার চরণ পাবার আশায় পাগল হয়ে রয়েছে। লীলাময়ী মহামায়ার লীলা খেলার কথা ভাবতে গিয়ে আর ভাবতে পারেন না। আর যতই ভাববার চেষ্টা করেন ততই যেন তাঁর মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আর এই ভাবনা চিন্তাকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁরই মনের মধ্যে 'আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী' বলে।—আহা! কি সুরের ঝঙ্কার—কি ভাষার লালিত্য আর কিবা অন্তরের আকুতি জানাচ্ছে রামপ্রসাদ জগন্মাতার চরণ তলে।

'আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী ॥'

আর ভাবতে পারেন না জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়।—তা' ছাড়া যতবার তিনি নূতন করে ভাববার চেষ্টা করেন ততবারই যেন তাঁর এই ভাবনা ব্যাহত করে দিয়ে ; তাঁরই চোখের সামনে ফুটে ওঠে হিসেবের খাতায় লেখা রামপ্রসাদের সেই মাতৃনাম গানটি—'আমায় দাও মা তবিলদারী।'

কি আকুতি! কি অব্যক্ত বেদনা যেন ঝরে পড়ছে 'আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী' আহা সত্যিই তাই! যদি সত্যি না হতো তা'হলে রামপ্রসাদ এমন করে কখনো মা'য়ের নামগান

থাকতে পারত না।—নিজের মনে কথাগুলি ভাবলেন জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়। কিন্তু একটা অতৃপ্ত বাসনা এসে তাঁর সমস্ত মন-প্রাণকে বার বার উদ্বেলিত করে তোলে। আর মন-প্রাণকে যতই উদ্বেলিত করে তুলুক না কেন, মনের মধ্যে একটা ধর্মভাব এসে তাঁর জীবন-মনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে থাকে। তাই তিনি হিসেবের খাতায় লেখা এই মায়ের নাম গানটি বার বার পড়তে থাকেন—

"আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ, স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি॥
আমি বিনা মাহিনার চাকর, শুধু চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তোমা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই ল'য়ে আমি মরি॥
ও পদের মতো পদ পাই তো সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি।"

একবার যখন গানটি পড়ে সমাপ্ত করেন জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়, আবার নূতন করে পড়েন; আর নূতন ভাবে সমাপ্ত করে একটা সুখানুভূতি অনুভব করতে থাকেন; ঠিক তেমনি সময় রাম-প্রসাদ ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়ের কাছে। তারপর কাছে এসে দাঁড়িয়ে ধীর অথচ বিনীত স্বরে বললেন, —হুজুর আমায় ডেকেছেন?

রামপ্রসাদের ধীর অথচ বিনীত কণ্ঠস্বরে জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় সস্নেহ দৃষ্টি তুলে তাকান তাঁরই মুখের দিকে। তারপর প্রশান্ত স্বরে বললেন; হ্যাঁ প্রসাদ তোমায় আমি ডেকেছি। কারণ তোমার নামে নানা অভিযোগ পেয়ে তোমাকে না ডেকে পাঠিয়ে পারলাম না। কিন্তু এখন দেখছি আমি তোমার কাছে হেরে গেছি।

মিত্র মশায়ের কথা শুনে, বিনীত স্বরে রামপ্রসাদ বললেন, হুজুর—

বাধা দিয়ে মিত্র মশায় বললেন, না রামপ্রসাদ এতে আর কিন্তু-টিন্তু নেই ; তবে তোমার কাছ থেকে একটি কথা জানতে চাই—সত্যি করে বল এই গানগুলি কি তুমি নিজেই রচনা করেছ ?

না হুজুর ! আমার কি শক্তি আছে ! জগন্মাতা যা' বলেছেন তা' আমি শুধু লিপিবদ্ধ করেছি। ধীর অথচ প্রশান্ত স্বরে বললেন রামপ্রসাদ।

ব্যাস ! এর থেকে আর বেশী কিছু আমার জানবার নেই। বলেই জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় রামপ্রসাদের গানের একটি কলি আপন মনে আবৃত্তি কবতে লাগলেন ;—'আমি বিনা মাহিনার চাকর, শুধু তোমার চরণ ধূলার অধিকারী।' বলতে বলতে তাঁর দু'নয়ন ভরে অশ্রুধারা নেমে এলো। তবু ও যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করে নিয়ে, জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় রামপ্রসাদকে বললেন,—দেখ রামপ্রসাদ তোমার নামে তোমারই উর্দ্ধতন কর্মচারী আমায় অভিযোগ করেছে, তুমি নাকি আমার জমিদারীর হিসেবের খাতাখানাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছ। সেজন্যই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম ; কিন্তু এখন পরখ কবে দেখছি—

বলতে বলতে মিত্র মশায় হঠাৎ কথাব মাঝখানটাই থেমে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

আর রামপ্রসাদ ?

রামপ্রসাদ ভাবাবেশে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়, ক্ষণকাল কি যেন ভেবে নিয়ে পুনশ্চ বলতে লাগলেন, হাঁ ! এখন আমি দেখছি, তোমার উর্দ্ধতন কর্মচারীরা তোমায় ঠিক চিনতে পারেনি বা জানতে পারেনি বলেই তোমার নামে অভিযোগ করেছে। কারণ, এই বিশ্বসংসারের মধ্যে তোমার জন্ম হয়েছে শুধু কর্ম করবার জন্য নয়। বিশ্বসংসারের নিত্যের মাঝে অনিত্যের সন্ধানের জন্য ; সে জন্য তুমি স্ব-গৃহে ফিরে

যাও, এবং ফিরে গিয়ে সেই অনিত্যের সন্ধান কর। আর হাঁ, তুমি চেয়েছ 'তবিলদারী' সেই তবিলদারী পাবার জন্যও আয়োজন কর। তবে হাঁ! রামপ্রসাদ তুমি আমার জমিদারীর হিসেবের খাতাখানি নষ্ট করনি। তোমার শ্রীহাতের লেখাতে এই খাতাখানি বড়ই পবিত্র হয়ে উঠেছে। বংশানুক্রমে এই খাতাখানি থাকবে। এই পর্যন্ত বলে জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় নীরব হয়ে গেলেন এবং এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, হাঁ রামপ্রসাদ হিংসা আর স্বার্থপরতা যেখানে সব সময় বিরাজ করছে; কেউ কারো ভালো চোখে দেখতে পারে না, সেইরূপ স্থানে তোমার স্থান নয়। তোমার স্থান সব সময় স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছে। সেজন্য বলছিলাম, তোমায় এই অর্থকরী সংস্রব থেকে মুক্তি দিচ্ছি। তুমি তোমার স্বদেশে গিয়ে আসল অর্থের সন্ধান কর রামপ্রসাদ। যে অর্থ একমাত্র বিশ্ব মায়ের 'তহবিলে' সঞ্চিত হয়ে রয়েছে; সেই অর্থের তহবিলে জিম্মাদারী হবার আয়োজন কর। বলেই আবার থামলেন জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়। এবং একটু খানি থেমে আবার বলতে লাগলেন।—

রামপ্রসাদ, তোমার শ্রীহাতের লেখা আমার এই সেরেস্তার খাতাখানা, আমার পরিবারে থাকবে, শুধু তোমার প্রেম ও ভগবদ্ ভক্তির সাক্ষ্য দেবার জন্য।—কারণ তোমার ভগবদ্ ভক্তি ও ভগবদ্ প্রেম দেখে তোমায় যারা পাগল—বদ্ধ পাগল বলে আখ্যা দিয়েছে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যই। আর আমার পারিবারিক আয় থেকে তুমি মাসে ত্রিশ টাকা করে বৃত্তি পাবে।

মনিব দুর্গাচরণ মিত্র মশায়ের কথা শুনে এবং বন্ধন থেকে মুক্তির আলোকের সন্ধান পেয়ে ভাবোন্মাদ রামপ্রসাদ আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলেন। ভাবতে পারেননি যে জগন্মাতা মহামায়া তাঁকে এমনি করে বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন। যে মুক্তিতে একমাত্র তাঁর জীবন মন সম্পূর্ণরূপে জগন্মাতার নাম-গানে সঁপে দিতে পারবেন। তাই

মনিব দুর্গাচরণ মিত্র মশায়ের কথা শুনে মাতোয়ারা হয়ে জগন্মাতার নাম গানে আত্মহারা হয়ে উঠলেন—

"মন, তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস না রে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে ভ্রমিতেছে দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামনি নিধি দেখিসরে তুই বসে বসে।
মনের মত মন যদি হও রাখবে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধ'রবে না আর কাল বিষে।
গুরুদত্ত রত্নতোড়া বাঁধরে যতনে কষে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি অভয় চরণ পাবার আশে।"

রামপ্রসাদের কণ্ঠের সুমধুর মাতৃনাম গানে সমস্ত জমিদার বাড়িটি যেন গম্ গম্ করে ওঠে। আর তারই সুর লহরীতে ছুটে আসে আমলা গোমস্তা সকলেই। তারা সকলেই ছুটে এসে বিস্ময়ে দেখে জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় তন্ময়ভাবে বসে রয়েছেন; আর পাগল রামপ্রসাদ আত্মহারা হয়ে গেয়ে চলেছে।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল সকলেই। তারা কেউ ভাবতে পারল না, কোন ঐন্দ্রিজালিক শক্তির ফলে, এমন রাশভারি জমিদারের মনকে এমন করে অভিভূত করে তুলেছে। তাই তারা নির্বাক হয়ে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি দেখতে লাগল।

আর জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায় রামপ্রসাদের কণ্ঠে মাতৃনাম গানে, আত্মহারা হয়ে ভাবতে থাকেন—এ কি আশ্চর্য। মনটা যেন বার বার ছুটে যেতে চাইছে সেই দুঃখহারিণী জগন্মাতার চরণ প্রান্তে। যেন মনটা লুটিয়ে পড়তে চাইছে অভয়ার অভয় পদে।

সার্থক রামপ্রসাদ। সার্থক তোমার সাধনা।

নিজের মনে কথাগুলি ভেবে নিয়ে অবশেষে জগন্মাতার নাম স্মরণ করে মনকে স্থির করে নিলেন জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র মশায়। তারপর রামপ্রসাদকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ?

রামপ্রসাদও আপন প্রভুর এই দয়া-দাক্ষিণ্যে আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠলেন—

"আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী।"

সত্যিই তাই !

রামপ্রসাদ কখনো 'নিমক্ হারাম' ছিলেন না। কেন না, আপন প্রভুর এই দয়া দাক্ষিণ্যের কথা তিনি জীবনে কখনো ভুলেন নি এবং ভুলতে পারেন নি বলেই রামপ্রসাদ একমাত্র জগন্মাতার নাম গান শুনিয়ে মিত্র মশায়ের এই দয়া-দাক্ষিণ্যের ঋণ পবিশোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

॥ ২ ॥

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁর কবি কঙ্কণ চণ্ডী'তে এক স্থানে বলেছেন—

"বামদিকে হালিশহর; দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু'কুলের যাত্রী রবে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস হেম তৈল ধেনু কেহ করে দান॥

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ছোট্ট একটি গ্রাম। নাম হালিশহর।

এই হালিশহর গ্রামটি ছোট্ট হলেই বা কি হবে! এর কীর্ত্তি গৌরব জ'াক জমক আর ঐশ্বর্য নেহাৎ যে কম ছিল না তা' কবি কঙ্কণ চণ্ডী রচয়িতা কবি মুকুন্দরামের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়।

কিন্তু কবি কঙ্কণ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বলে গেছেন বলেই নয়, বৈষ্ণব গুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান হিসাবেও এই হালিশহর গ্রামটি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তারও একটা কারণ আছে। সেই কারণটা আর কিছু নয়—শ্রীচৈতন্যদেব যখন এই হালিশহর গ্রাম

নিবাসী ভক্ত-সাধক ঈশ্বরপুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হলেন সেই সময় তাঁর পার্শ্বচর হিসাবে কবিরাজ বৃন্দাবন দাস তাঁরই সঙ্গে ছিলেন এবং এই হালিশহর গ্রাম সম্বন্ধে তাঁরই রচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের পর গুরু ঈশ্বরপুরীর চরণ দর্শনের আশায় এই হালিশহরে আসেন। সেই সময়ে নদের গৌর হরিকে দেখবার জন্য নাকি শুধু হালিশহর গ্রামের কেন, তার আশে পাশের বহু গ্রাম থেকে শত শত দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছিল এবং কথিত আছে নদের গৌরহরিকে দর্শনের আশায় এই শত শত দর্শনার্থী সমাগমে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আপন গুরুর চরণ দর্শন প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে দাস বৃন্দাবন ঠাকুর তাঁর রচিত চৈতন্য ভাগবতে বলেছেন—

"আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥"

দাস বৃন্দাবন ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবকে নররূপী ভগবান বা ঈশ্বরাবতার বলে উল্লেখ করতে দ্বিধা বা সংকোচ করেন নি।

শ্রীচৈতন্যদেব এই হালিশহরে এসে বৈষ্ণব গুরু এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস ধর্মেব দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান এই হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রাম দর্শন করলেন। গ্রাম দর্শন করেই শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—

"প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার॥
কান্দিলেন বিস্তর প্রভু সেই স্থানে।
আর কিছু শব্দ নাই—ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বান্দি এক ঝুলি॥"

অবশ্য এই উক্তিটাই শুধু দাস বৃন্দাবন ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-

ভাগবতে উল্লিখিত আছে। কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ ও অনুগত ভক্ত হিসাবে, দাস বৃন্দাবন ঠাকুরের নাম ন্যুনাধিক নয়। কেন না দাস বৃন্দাবন ঠাকুর একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ ছিলেন তেমনি অন্যদিকে লিপিকার ও উন্নত ধরণের কীর্তনীয়াও ছিলেন।

কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে—এই সুপ্রাচীন শহর-গ্রাম হালিশহরের নানা অলৌকিক ঘটনাবলীর সঙ্গে আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় গুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহট্টে এসে একস্থান থেকে শ্রদ্ধাসহকারে কিছুটা মাটি আপন বহির্বাসে বেঁধে নেন আর তাঁর দেখা-দেখি তাঁরই দর্শনার্থীরা ঝুলি ঝুলি মাটি তুলে নিয়ে যেতে লাগলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের দেখা-দেখি ঝুলি ঝুলি মাটি তুলে নিয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে ক্রমে একটা ছোট-খাট পুকুরের আকারে একটা ডোবার সৃষ্টি হয়। আর এই ডোবার সৃষ্টি হওয়ায় পরবর্তী কাল থেকে হালিশহর কুমারহট্ট এবং আশে পাশের গ্রামের অধিবাসীরা, সেই ডোবাটির নাম 'চৈতন্য ডোবা' বলে অভিহিত করেন। তবে অতীতের এই 'চৈতন্য ডোবা' আজ শ্রীহীন হয়ে অতীতকে প্রকাশ করে চলেছে। শুধু তাই নয়; অতীতের এই হালিশহর ও কুমারহট্ট গ্রাম আজ শ্রী ও ঐশ্বর্য হীন হয়ে পড়লেও কি হবে? এমন একদিন ছিল—যার শ্রী আর ঐশ্বর্যের কথা শুনে সুদূর দেশ থেকেও নানান গুণী-জ্ঞানীরা ছুটে আসতেন এই হালিশহর আর কুমারহট্ট গ্রামে চিরস্থায়ী হয়ে বসবাস করবার জন্য।

শুধু যে সারা বাংলা দেশে এর শ্রী ও ঐশ্বর্যের কথা, কীর্ত্তি-গৌরবের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল তা' নয়; ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিশেষতঃ এই হালিশহর ও কুমারহট্ট গ্রাম শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায়, আচার-ব্যবহারে এতই উন্নত ছিল যে, তৎকালীন জ্ঞানী-গুণীরা, এই হালিশহরের সঙ্গে তৎকালীন সংস্কৃত শিক্ষার আদি কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করতে এতটুকু দ্বিধা বা সংকোচ করতেন

না। তা'ছাড়া, তৎকালীন অনেক জ্ঞানী-গুণীরা এই হালিশহরকে 'দ্বিতীয় নবদ্বীপ' বলে অভিহিত করতেন। অবশ্য এই হালিশহরকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ অভিহিত করবারও যথেষ্ট কারণ ছিল। সেই কারণ গুলির কথা বলতে গেলে বলতে হয়—একদিকে এই হালিশহর শিক্ষা-দীক্ষায় আর সাংস্কৃতিতে যেমন চরম উন্নতির শিখরে উঠেছিল; তেমনি তন্ত্র-মন্ত্র যোগ সাধনারও একটা কেন্দ্রস্থল ছিল। এই হালিশহর যে তন্ত্র-মন্ত্র যোগ সাধনার দিক্ দিয়ে কোন অংশে হীনবল ছিল না তা' সাধক কবি রামপ্রসাদের বর্ণিত অংশ থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাবে। যেমন—

"ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম।
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ-পুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা ॥"

আর এই হেন কুমারহট্ট গ্রামে ঠাকুর পাড়া ও চড়ক ডাঙ্গার মধ্যে সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর সাধন পীঠ তৈরী করেছিলেন। অর্থাৎ তন্ত্র সাধনার চরম পীঠাসন পঞ্চমুণ্ডীর আসন তৈরী করে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হয়ে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এবং জগন্মাতার কৃপা ও দর্শনলাভও করেছিলেন। উপরন্তু মাতৃনাম গানে জগন্মাতার আসনকেও বার বার প্রকম্পিত করে তুলেছিলেন; তারই দৃষ্টান্ত আমরা সাধক কবির জীবনাখ্যান পাঠকালে ক্রমে ক্রমে দেখতে পাব।

॥ ৩ ॥

সাধক রামপ্রসাদের জন্মক্ষণের 'সুতিকা' ঘরের কোন সংবাদই আমরা জানতে পারি না; শুধু তা'নয়, তাঁর জন্মক্ষণের সময়, তারিখ, সন নিয়ে অনেক সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক জীবনীকারদের মধ্যে নানা মতদ্বৈতের সৃষ্টি হয়েছে।

অনেক জীবনীকার স্বয়ং সাধক কবির স্বরচিত 'আত্মপরিচয়কে'

কেন্দ্র করে, তাঁর জীবনাখ্যানকে রচনা করেন। বর্তমান 'সাধক কবির' এই জীবনীকারের সেই পথানুস্মরণ ভিন্ন অন্য কোন পথই নেই। সুতরাং বর্তমান জীবনীকারও সেই পথানুস্মরণ করে, সাধক কবির এই জীবনাখ্যান রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

সাধক কবি রামপ্রসাদ, তাঁর "বিদ্যাসুন্দর কাব্য" [১] রচনা করতে গিয়েই প্রথমে স্বীয় জন্ম কাহিনী ও আপন বংশ পরিচয় অতীব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন এবং তাঁর এই জন্মকাহিনী আর বংশ পরিচয় থেকে আমরা সহজেই জানতে পারি সাধক কবির বংশের কথা কিন্তু সন ও তারিখের কথা জানতে পারি না। অতএব সাধক কবির স্বকীয় জন্ম বৃত্তান্ত থেকে উদ্ধৃত করে দেখালে তা সকলের কাছেই সহজে অনুমেয় হয়ে দাঁড়াবে। সাধক কবি বলেছেন—

"ধনহেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল,
কীর্ত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দয়াশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানান্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামই।
সেই বংশ সমদ্ভুত ধীর সর্ব-গুণযুত,
ছিল কত শত মহাশয়।
অনাচার দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবী পুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহা কবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া॥
প্রসাদ তনয় তার[২] কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া॥

---

(১) বিদ্যাসুন্দর কাব্য, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে, রামপ্রসাদ রচনা করেন। তাঁর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আমরা স্থানান্তরে করবো।

(২) রামপ্রসাদের এই জন্ম বৃত্তান্ত থেকে আমরা তাঁর জন্ম মাস তারিখ ও সন কিছুই জানতে পারি না। আমরা তাঁর এই বংশ পরিচয় থেকে, পিতামহের নাম, জ্যেষ্ঠ তাত আর পিতার নাম জানতে পারি। রামপ্রসাদের পিতার নাম রাম রাম সেন।

জ্যেষ্ঠাভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।
যার পাদ আমি রাত্রিদিবা সেবি ॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরমবৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্বগুণ ধাম ॥
সর্বাগ্রজা ভগ্নীবটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা ॥
গুণনিধি নিধিরাম[৩] বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তাঁরে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা ॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥
শ্রী কবি রঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরাম দুলালে মাগো দেহি-পদধূলি ॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্বজ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে[৪] ভনে কবিতা অদ্ভুতা ॥

এই উদ্ধৃতাংশ থেকে আমরা শুধু সাধক কবি রামপ্রসাদের বংশ পরিচয়টাই জানতে পারি। অথচ তাঁর জন্ম-মাস সন-তারিখ কিছুই জানতে পারি না। কারণ তিনি তাঁর স্ব-রচিত এই বংশ পরিচয়টির মধ্যে কোন উল্লেখই করেন নি। আর কেন যে করেন নি তা বলা দুষ্কর।

তবে সাধক কবি রামপ্রসাদ আপন বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে

(৩) নিধিরাম,—রামপ্রসাদের বৈমাত্র ভাই।

(৪) 'কবিরঞ্জন,'—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রচনা করে দেবার জন্য আদেশ দেন, আর রামপ্রসাদ সেই আদেশ রক্ষার্থে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে দিলে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে সাধক কবিকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করেন।

বলেছেন যে তাঁর পিতামহের নাম রামেশ্বর। আর এই রামেশ্বরের পুত্র রামরাম সেন। এই রামরাম সেনের পুত্রই হচ্ছেন সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। কিন্তু এখানে আরো একটু বিশদভাবে বলে রাখা নেহাত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনালোচনা কালে তাঁর বংশ পরিচয়ের আবশ্যকতা আছে বলেই এই বিষয়টি উত্থাপন করতে বাধ্য হলাম। সাধক কবি রামপ্রসাদের পিতা রামরাম সেনের দুই বিবাহ ছিল। প্রথমা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নিধিরাম সেন আর দ্বিতীয় পত্নী সর্বেশ্বরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন প্রথম দুটি কন্যা—অম্বিকা আর ভবানী। তার পরে সাধক কবি রামপ্রসাদ ; এবং তাঁরই কনিষ্ঠ ভাই বিশ্বনাথ সেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সাধক কবি রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভাই নিধিরাম, সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী অম্বিকা আর সর্বকনিষ্ঠ ভাই বিশ্বনাথের সম্বন্ধে বর্তমানে কোন তথ্য ও তত্ত্ব সঠিকভাবে সংগ্রহ করা দুরারোহ ব্যাপার।

কেননা তাঁদের সম্বন্ধে কোন তথ্য ও তত্ত্ব সাধক কবি রামপ্রসাদ যেমন দিয়ে যাননি তেমনি অন্য কেউ সংগ্রহ করে রাখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহের ব্যাপার। তবে সাধক কবি রামপ্রসাদের স্ববংশ পরিচয় থেকে আমরা শুধু একথা জানতে পারি যে—তাঁর অগ্রজা অম্বিকা দেবীর বিবাহ হয়েছিল কলিকাতা নিবাসী বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ও পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সঙ্গে। এই লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের ঔরষে অম্বিকা দেবীর গর্ভে দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করে। তাদের নাম যথাক্রমে জগন্নাথ ও কৃপানাথ।

জগন্নাথ আর কৃপানাথ এরা দুই জনেই ছিল সাধক কবি রামপ্রসাদের বিশেষ অনুরক্ত ও অনুগত। এই সংবাদটি সঠিক কবির স্ববংশ পরিচয় থেকে আমরা জানতে পারি।

কিন্তু সাধক কবির এই বংশ পরিচয়ে তাঁর পত্নীর সম্বন্ধে কোন সংবাদই পরিবেশন করেন নি। কেন যে পরিবেশন করেন নি আর কেনই বা স্বীয় পত্নীর ব্যাপারে এত উদাসীন ছিলেন তা

বলা দুষ্কর। তবে সাধক কবি রামপ্রসাদ—তাঁর দুই কন্যা জগদীশ্বরী ও পরমেশ্বরীর এবং এক পুত্র সন্তান রাম দুলালের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর সর্ব কনিষ্ঠ পুত্রের কথা উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে যখন সাধক কবি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁর এই সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্ম হয়নি। সেই কারণ হেতু—রামমোহনের নাম 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের মধ্যে উল্লেখ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তবে একথা ধ্রুব সত্য যে,—তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পর এই মায়ার সংসারকে 'ধোঁকার টাটি' বলে একটি গান রচনা করেন। তবে আবহমান কাল থেকে অনেক জীবনীকার এই কথাটি প্রচার করে আসছেন। এই কথাটি যে, 'মূল' তা সঠিক করে বলা যায় না। তবে কবির স্বরচিত নিম্নক্তো গানটি থেকে অনুমান করাটাও নেহাত অপ্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং গানটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো গেল—

"এ সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজার লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন সবার জলে সূর্যছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি।
গর্ভে যখন যোগী তখন—ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।
রমনী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছট-ফটি।'
আনন্দ রামপ্রসাদ বলে আদপুরুষের খাদ্ মেয়েটি।
ওমা যা ইচ্ছা হয়, তাই কর মা, তুই তো পাষাণের বেটি।"

মায়ার 'সংসারটি' যে ধোঁকার টাটি' এই তথ্যটি যে মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলেন সেই মুহূর্ত্তেই সাধক কবির মনের মধ্যে একটা অজানিত বৈরাগ্য ভাব উদয় হল। আর এই বৈরাগ্যের মূলেই যে তাঁর

কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন এ কথা অভ্রান্ত। কারণ—রামমোহনের জন্মের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মায়াময়ী সংসার তরণীকে ধোঁকার টাটি বলে উল্লেখ করেননি। এমনকি 'মহামায়ার' দরবারে আর্জিও পেশ করেননি।—তাছাড়া সংসার যে একটা 'ধোঁকার টাটি' এই সত্য উক্তিটি উপরোক্ত গানের মধ্যে বিচিত্ররূপে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াসী হয়েছেন। বিশেষতঃ—'সংসার ধোঁকার টাটি' গানটির মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্রতম মানব সংসারে যে বাস্তব চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সামান্যাতীত। কেন না আমাদের মনুষ্য সমাজের প্রতিটি জীব ভোগ-বাসনা-কামনার মধ্যে সংসারে বাস করে। এই ভোগ-বাসনা আব কামনা তাদের একমাত্র উপজীব্য হয়ে ওঠে। প্রতিটি মানুষ এর অতিরিক্ত কিছুই ভাবতে পারে না। কিন্তু সাধক কবি রামপ্রসাদ—এই মানব সংসারের ভোগ-বাসনা-কামনাকে ক্রমশঃ ভয়ের চোখে দেখতে লাগলেন। কারণ পাছে তিনি এই সংসারের মায়াব জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এই ভয়ে। তাই সংসারের এই মায়ার বন্ধনকে কাটবাব জন্য—এই মায়ার সংসারকে 'ধোঁকার টাটি' বলে উল্লেখ করেছেন।

যদিচ এই মায়ার সংসারেব বন্ধনকে খণ্ডন করতে পারেন তবুও বিশ্বজননীর স্নেহের বন্ধনেব পাককে কাটবার শক্তি কারো নেই। কেন না—বিশ্বজননীব মায়ার বন্ধন অষ্ট পাকে আবদ্ধ কবে—তাঁর যেমনটি ইচ্ছা তেমনটি করে পাক দিতে থাকেন। সেই পাক-চক্রের হাত থেকে মুক্তি পাবার শক্তি সাধক কবি রামপ্রসাদেরও ছিল না। তাই তিনি আকুল হয়ে জগন্মাতার চরণ তলে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন, 'ওমা যা ইচ্ছা হয় তাই কর মা তুই তো পাষাণের বেটি।'

সত্যিই ত! জগন্মাতা যদি পাষাণের বেটি না হবেন তা' হলে কি এমনি করে আপন ভক্ত সন্তানকে কাঁদাতে পাবতেন?—পাষাণের বেটি বলেই ত আপন ভক্ত সন্তানকে কাঁদাতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

রামপ্রসাদ এমনি আকুল কান্নার ভিতর দিয়ে মাতৃ-নামগানে আত্মসমাহিত হয়ে থাকতেন। সেই সময় এই হালিশহরে আজু-

গোঁসাই নামে একজন সদাচার সদারসিকময় ব্রাহ্মণের নাম আমরা জানতে পারি। তিনি এই হালিশহরে এসে আপন আস্তানা গেড়েছেন অথচ কোন জীবনীকার তার সম্যকরূপে পরিচয় দিতে পারেননি। তবে এই আজু গোঁসাই যে কে এবং কোথা থেকে এসে এই হালিশহরে আশ্রয় গেড়ে বসেছেন তারও কোন হিসেব পাওয়া যায় না। হয়তো এই গোঁসাইজী স্বইচ্ছায় তাঁর পরিচয় দিতে পরান্মুখ হয়ে রয়েছেন।

তবে প্রত্যেক জীবনীকারগণ একথা স্বীকার করেছেন যে—এই আজু গোঁসাই একজন সুদক্ষ জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ছিলেন। তবে তাঁর এই গুণ জ্ঞান আর পাণ্ডিত্য সুদূর প্রসারিত না হলেও, ব্যঙ্গ কবি হিসেবে তাঁর সমধিক পরিচয় ছিল এই হালিশহরে। বিশেষতঃ ব্যঙ্গ গীতি রচনাতে এই আজু গোঁসাই ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

সাধক কবি রামপ্রসাদ যেসব শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে. সংসার যাতনা ভোগী মানব হৃদয়কে ভক্তি প্রেমে মাতোয়ারা করে তুলছিলেন; সেই সময় সাধক কবি রামপ্রসাদের এই সব শ্যামাসঙ্গীতের প্রত্যুত্তরে আজু গোঁসাই ব্যঙ্গাত্মক গীত রচনা করে গাইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁর এই সব ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে স্থানীয় লোকমুখে গীত হিসাবে যেসব কবিতা শোনা যায় তার কয়েকটি উদ্ধৃত করে দেখানো গেল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রামপ্রসাদের কনিষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর. যখন বিশ্ব মায়ার সংসারটিকে 'এই সংসার ধোঁকার টাটি' বলে. মহামায়ার কাছে আকুল হয়ে গেয়েছেন—তারই উত্তরে আজু গোঁসাই লিখেছেন, এবং স্বকণ্ঠে গেয়েছেন—

"এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥
ওরে যার যেমন মন তার তেমন ধন, মন করবে পরিপাটি।
ওরে স্থান, নাহি জ্ঞান—বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে, ভাই বন্ধু দারা সুতে, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি।
রমণীরে বিষ ভেবেছ, তাতেও তো না দেখি ত্রুটি।

তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা, কাঁচিয়েছ পাকা ঘুঁটি।
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া, ভাবছ মায়ার বেড়ি কাটি।
তবে শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামা মায়ের চরণ ছুটি।”

আজু গোঁসাই এমনি ধরনের ব্যঙ্গপূর্ণ পদ রচনা করে, সাধক কবির মাতৃনাম গানের উপহাস করতেন। তবে একথা আজো কেউ স্বীকার করেননি যে এই আজু গোঁসাই একটা হিংসাত্মক ভাব নিয়ে কোন পদ রচনা করে সাধক কবিকে অপদস্ত করাবার জন্য চেষ্টা করেছেন। তবে একথা স্বীকার্য যে: আজু গোঁসাই-এর এইসব পদের মধ্যে ছিল একটা আন্তরিকতা, একটা সরল মন-প্রাণের আনন্দোচ্ছ্বাস। আর এই আনন্দোচ্ছ্বাসকে চরিতার্থ কববাব জন্যই এইসব পদ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কিন্তু একটি প্রবাদ আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে যে কোন সাধক তপস্বীর পূর্ণতর সিদ্ধিলাভ করতে হলে সহস্র বাধা-বিপত্তিকে জয় করে নিয়ে সাধনাব পথে অগ্রসব হতে হয়। এই প্রবাদ বচনটি যে কত বড় সত্য—তা' সাধক কবির জীবনালোচনা করতে গিয়ে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। কেন না সাধক কবি রামপ্রসাদ যখন মাতৃনাম গানে আত্মহারা হয়ে তাঁর মাতৃনাম গানের ভিতর দিয়ে যে সাধনার পথে এগিয়ে চলছিলেন সেই সময় আজু গোঁসাই তারই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সাধক কবি রামপ্রসাদ তা' সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে আপন ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। আর এমনি একদিন এই ভাবে বিভোর থাকাকালীন রামপ্রসাদ আপন ভাবের ঘোরে গেয়ে উঠেছিলেন—

“এবার কালী তোমায় খাবো।
(খাবো খাবো গো দীন দয়াময়ী।)
তারা, গণ্ড যোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জন্মিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
ছুটার একটা করে যাব॥

হাতে কালী, মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কষে
সেই কালী তার মুখে দিব।
খাবো খাবো বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাবো।
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাবো।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাবো।
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন, যা হবার তা' ঘটাইব ॥"

সাধক কবি যখনই মা'য়ের গানে আত্মহারা হয়ে থাকতেন ঠিক তেমনি সময় আজু গোঁসাই তারই প্রতিটি উত্তর দিয়ে যেতেন। আর তাঁর এই সকল উত্তরগুলির রচনার সৌষ্ঠব, ভাষার নৈপুণ্যতা আর বাচন ভঙ্গির শক্তি ছিল অপূর্ব। সাধক কবি রামপ্রসাদ যে মুহূর্তক্ষণে আত্মহারা হয়ে মা'য়ের নাম গান রচনা করে গাইতেন; ঠিক তার পরমুহূর্তেই তার প্রতি উত্তরটি রচনা করে বসতেন আজু গোঁসাই। শুধু রচনা নয় স্বরচিত গানটি নিজেই গেয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। তারই উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে রামপ্রসাদ যে মুহূর্তেই "এবার কালী তোমায় খাবো।" গানটি রচনা করে গাইতে লাগলেন; ঠিক তারই পরমুহূর্তেই আজু গোঁসাই তার প্রতি উত্তরটি রচনা করে গাইলেন—

"সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে, তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি,
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে, ভূষো কালী মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা, নিজে যে কলা দেখিবি।"

এমনি নানা ব্যঙ্গাত্মক রচনা সৃষ্টির দিক দিয়ে এই আজু গোঁসাই কতবড় শক্তিশালী প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন তা তাঁর সমগ্র ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করলে অতি সহজেই সকলেই বুঝতে পারতেন। আজু গোঁসাই একটা মহৎ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তবে একথা স্বীকার্য যে আজু গোঁসাইয়ের এই সব ব্যঙ্গ রসাত্মবোধ রচনাগুলি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে কোন মহৎ ব্যক্তি বা জীবনীকার যদি এই সব রচনা সমষ্টি সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে পারেন তা'হলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবো যে, আজু গোঁসাইয়ের এই সব রচনা বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে, এবং বাংলা ভাষার শ্রী ও গৌরবকে আবহমান কাল বজায় রাখবে।

॥ ৪ ॥

ভক্তের জীবনে সাধনাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর!

কেননা, ভক্তি মার্গের পথকে যদি কোন ভক্ত সুগম করে নিতে পারেন, তা'হলে ভক্ত তাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব জাগ্রত করে তুলতে পারেন। এবং সেখানেই ভক্ত আত্মদর্শন করার কালে ভগবৎ দর্শন লাভ করতে পারেন। কিন্তু এই ভগবৎ দর্শনের মূলেই হচ্ছে আত্মবিশ্বাস! আর এই আত্মবিশ্বাস এলেই, সাধন মার্গের পথ সুগম হয়ে ওঠে। তাই সাধক ও ভক্ত প্রবরেরা এই আত্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে সাধনার পথে এগিয়ে চলেন।

তবে অনেক ভক্ত ও সাধকদের মতে—যে সাধন পথেই এগিয়ে যাওনা কেন, সকল সাধনার থেকে শ্রেষ্ঠ সাধনাই হচ্ছে শাক্ত সাধনা। কেন না, এই মহাশক্তিই হচ্ছে ভক্তি ও সাধন মার্গে একটা অতি সুগম পথ।

কিন্তু এই শক্তি সাধনা যতই সুগম পথে হউক না কেন, মহামায়া মহাশক্তির অপার করুণা লাভ করতে গেলে চাই দুরারোহ তপস্যা, তন্ত্র-মন্ত্র। যে এই তন্ত্র-মন্ত্রে ও দুরারোহ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারবে সেই একমাত্র মহামায়া মহাশক্তির স্নেহাশীষ লাভ করতে পারবে। তন্ত্র-মন্ত্রধারী সাধক ও ভক্তরা অবশ্য একথা বলেই মহামায়া মহাশক্তিকে ডাকার পথটিকে দেখিয়ে দেন বটে, কিন্তু সহজ সরল পথটিকে তাঁরা কখনো প্রদর্শন করাতে পারেন না। অবশ্য

তাঁরা একথাও বলেন না যে মহাশক্তির সাধনার পথের মধ্যে অন্তরের আকুল আকুতি আর ভক্তি প্রেমাশ্রুই এই শক্তি সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। তন্ত্র সাধনকারীরা বলেন শক্তি-সাধনের সর্ব প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনা।

এই তান্ত্রিক সাধনায় যদি তুমি 'সিদ্ধি' লাভ করতে পার, তা হলে দেবী মহামায়া মহাশক্তির 'মাতৃরূপকে' প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কিন্তু দেবী মহামায়া মহাশক্তির মাতৃকারূপ এই তন্ত্র-মন্ত্রের দ্বারাই যে সব সময় সিদ্ধিলাভের পথ সুগম হয়ে ওঠে তা নয়, অন্তরের আকুল ক্রন্দনে, আকুল আবাহনে মাতৃহৃদয়কে প্রকম্পিত করে তুলতে পারলে এবং তাঁর পাষাণময় আসনকে টলাতে পারলেই মায়ের অপার মহিমাকে দর্শন করতে পারবে। আর সেখানেই হবে তোমার সিদ্ধিলাভ।

তন্ত্র-মন্ত্রেব দ্বারা তোমার সাধনার পথ সুগম না হলেও, অন্তরের আকুল আকুতির ভিতর দিয়ে তা' সুগম হয়ে উঠবে। সাধক কবি রামপ্রসাদের পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই বলেছিলেন, ডাক্। ডাক্। আকুল হয়ে মা-মা বলে ডাক্। দেখবি, তোর আকুল ডাকে, তোর আকুল কান্নায় মা সাড়া না দিয়ে থাক্তে পারবেন না।"

এর পরেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপন ভাবে বিভোর হয়ে বলে ছিলেন, "মা! মাগো আমি তন্ত্র জানি না, মন্ত্র জানি না মা। শুধু আমার এই অর্ঘ্য তুলে নে মা।" আর—

শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক তারাপীঠ ভৈরব—সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেছিলেন, "নে মা খা। খা। আগে খেয়ে নে মা। তাবপর ফল নিবি।"

অর্থাৎ তন্ত্র-মন্ত্রকে সব একাকার করে দিয়ে তাঁরা 'মা' বুলিটিকে একমাত্র অবলম্বন করে নিয়েছেন। আর সাধক কবি রামপ্রসাদ এক-মাত্র মাতৃনাম গানের মধ্যে আকুল হয়ে মায়ের জন্য কেঁদেছেন, অভিমান করেছেন—আবার কখনো কখনো গালি দিতেও কসুর

করেন না। যেমন তাঁর এই মাতৃনাম গানের থেকে সহজে বোঝা যাবে—

"মা মা বলে আর ডাকবো না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।"

সাধক কবি রামপ্রসাদ জগন্মাতার দর্শন লাভের আশায় এমনি ভাবে আকুল হয়ে কেঁদেছেন—মায়ের উপর অভিমান করেছেন। শুধু এক মুহূর্তের জন্য দর্শন লাভের আশায়। তবে আমরা একথা বলি না যে, শক্তি সাধনা করতে গেলে তন্ত্র মতে সাধনা করা একেবারে বিবর্জিত। কারণ, এই তন্ত্র সাধনা মহাশক্তির সাধনার কালে একটা অংশ নিয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হয়ে রয়েছে। কেন না, এই তন্ত্র সাধনাতে আত্মশুদ্ধি ও মনশুদ্ধির পথকে দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, মায়াময়ী সংসারের মায়া, মোহ ও মমতা থেকে মুক্তি মার্গের পথ—এই তন্ত্র সাধনা থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

তবে অনেক তান্ত্রিক যোগী ঋষিরা বলেন, আত্মদর্শনই মাতৃদর্শনের সমান হয়। আগে আত্মদর্শন করবার চেষ্টা কর, তা' হলে তুমি মাতৃদর্শন লাভ করতে পারবে। আর এই মাতৃদর্শন লাভ করা মানেই পূর্ণজ্ঞানের বিকাশ। যে মুহূর্তক্ষণে তুমি পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ অনুভব করবে, সেই মুহূর্তক্ষণে তন্ত্র-মন্ত্র সব একাকার হয়ে যাবে।

সাধক কবি রামপ্রসাদ যে সময় লীলা করেন, তার অনেক বৎসর পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আগেই মাতৃদর্শন লাভ করেন। তার পরবর্ত্তী কালে তন্ত্র-মন্ত্র, ধ্যান, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় আচার-বিধি করেন। আর সাধক কবি রামপ্রসাদ মাতৃদর্শন লাভের আশায় মাতৃনাম-গানে আত্মহারা হয়ে থাকতেন; আকুল ক্রন্দনের ভিতর দিয়ে সর্ব দুঃখ-হারিনী মাকে ডেকেছিলেন। অভিমান করেছিলেন, গালি দিয়েছিলেন মাতৃনাম-গানের ভিতর দিয়ে—

'মা মা বলে আর ডাকবো না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।'

রামপ্রসাদ এই বলেই প্রথমে অভিমান করছেন, তারপর আকুল ক্রন্দনের ভিতর দিয়ে আবার বললেন, মাগো তোকে আর মা মা বলে ডাকবো না, তোর কাছে খাবার জন্য অন্নও চাইব না। কেন না—

"ঘরে ঘরে যাবো মাগো, ভিক্ষা মেগে খাবো
মা মা বলে আর কোলে যাব না।"

তার পর মুহূর্তেই আবার বলেছেন --

"ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে
মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না।
বলে, রামপ্রসাদ মায়েব কি এ সূত্র
মা হ'য়ে হলি মা সন্তানের শত্রু।
দিবা নিশি ভাবি আর কি করিবি ;
দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণা।"

এমনি ভাবে জগন্মাতার দর্শনের আশায় আশায়, অন্তরের আকুল ক্রন্দনে, আর মাতৃনাম গানের মধ্যে রামপ্রসাদ আত্মহারা হয়ে থাকতেন। এমন আত্মহারা হয়ে থাকতেন যে তাঁর কোন বাহ্যিক সজ্ঞা পর্যন্ত থাকত না। আর এমনি সজ্ঞাহীন ভাবে তাঁর দিনের পব দিন অতিবাহিত হয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু এই সবেরই মধ্যে সাধক কবির অন্তরের অদম্য আশা, আখাঙ্খা কোন মতে পূর্ণ হয় না। পূর্ণ হয় না জগন্মাতাকে দর্শন লাভ করবার আশা। তাই তাঁর অন্তরের সমস্ত ক্রন্দন রোল যেন উজাড় কবে ঢেলে দিতে চান্ অভয়ার অভয় চরণ তলে। কিন্তু, সাধক কবি রামপ্রসাদের সেই আকুল ক্রন্দনে, সেই অভিমানে বিশ্ব নিয়ন্ত্রী জগন্মাতা কোন আমলই দেন না। যেন চক্ষু-কর্ণের মাথা খেয়ে নীরবে অশেষ যন্ত্রণা দিতেছেন, আর দিচ্ছেন।

তাঁর এই সহনাতীত নীরবতায় রামপ্রসাদ মর্মে যেন মরে গেলেন। আর মর্মে মরে গিয়েও একমাত্র জগন্মাতার জন্য আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন। কেন না, এই মায়াময় জগৎ সংসারে এক অভয়ার অভয় চরণ ভিন্ন কোন গতি নেই। আর একমাত্র ওই সুধাময় মাতৃনাম ভিন্ন কোন পথই নেই।

তাই ত রামপ্রসাদ আকুল হয়ে ডাকেন, দু'নয়ান ভরে কাঁদেন জগন্মাতা মহামায়ার রাঙা চরণ দু'খানি পাবার আশায়—দেখা দে মা দেখা দে। আমার দু'নয়ান ভরে তোর 'ওই অপরূপ রূপ দর্শন করে নিয়ে মা আমার জীবন সার্থক করে নি'। শুধু একটি বার দেখা দে মা। এমনি করে তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন। আর কাঁদতে কাঁদতে আবার মাতৃনাম গান করতে থাকেন—

"আমি কি এমনি রবো মা তারা।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়াহীন ভজন বিহীন।
দীনহীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাবো মা তারা।"

মা'কে পাবার আশায়, সাধক কবি রামপ্রসাদের মন কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে 'ও রাঙ্গা চরণ দু'খানির জন্য। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ করেন না জগন্মাতা! আর করবেনই বা কি করে? যদি কাঁদার মতন কাঁদতে না পারলেন, আর সেই কান্নার মধ্যে মা'কে পাবার জন্য আকুলতা না থাকলে মা'য়ের মনকে নাড়া দেবেনই বা কি করে? কি করেই বা তাঁর আসনকে টলাবেন:—কি করেই বা তাঁর আসনকে বার বার প্রকম্পিত করে তুলবেন!

জগন্মাতার মনকে নাড়া দিতে গেলে, তাঁর আসনকে টলাতে হলে—আর বার বার প্রকম্পিত করতে গেলে চাই আকুল কান্না। যে কান্নার মধ্যে মাকে পাবার জন্য, মায়ের রাঙ্গা চরণ বক্ষে ধরবার

জন্য ব্যাকুলতা জাগবে সেই কান্না কাঁদতে হবে। তাই ত সাধক কবি রামপ্রসাদ সেই কান্না কাঁদেন। আকুল হয়ে মা মা বলে কাঁদেন। একমাত্র জগন্মাতার অভয় চরণ পাবার জন্য—

"সুপুত্র কুপুত্র, যে হই সে হই
চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
একথা কাহারে কবো মা তারা॥
প্রসাদ কহিছে তারা-ছাড়া নাম
কি আছে যে আর তা লবো।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটি রেখেছেন ভব, মা তারা॥"

কত আর্তি, কতই ব্যাকুলতা বেড়ে চলে রামপ্রসাদের। কিন্তু মায়ে'র দর্শন লাভ কিছুতেই করতে পারেন না। যেন পাষাণ দেবী আরো কঠোর কঠিন পাষাণে পরিণত হয়ে, ভক্ত সন্তানের সকল বাসনাকে ব্যর্থ করে দিতে চান জগন্মাতাই। কিন্তু, যে সন্তান একমাত্র জগন্মাতাকে মা বলে জানে;—এবং এই জগন্মাতার নাম গানে পাগল হয়ে থাকেন, মায়ে'র ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন তাঁকে যে ঠেকানো বড় দায়।

কিন্তু জগন্মাতাকে তবুও যাচাই করতে হয়—বিচার করে দেখতে হয় তাঁর ভক্ত সন্তানের তাঁরই প্রতি ভক্তি-বাৎসল্য প্রেম কতদূর পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে।

কেন না, যে সন্তান জগন্মাতার মনমোহিনী রূপ মাধুরী এবং জগন্মাতার চরণ দর্শন করবার জন্য বার বার ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, তার যাচাই ও বিচার না করলে যে, মা'ই তাঁর স্বভাব ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যান। তাই ত মা'য়ের এত যাচাই, এত বিচার।

যে সন্তান মা'য়ের নামে পাগল,—ম'ায়ের দর্শন লাভের আশায় পাগল হয়ে ওঠে, মুহুর্মুহু সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তাঁকে কত যাচাই, কত বিচার করবেন জগন্মাতা! তা'ছাড়া যে সন্তান মাতৃনাম

গানের মধ্যে কত অমানিশা, কত অমাবশ্যার রাত্রির গভীর অন্ধকারের ভিতর কাটিয়ে দেন, তারই জন্য ত জগন্মাতার ব্যাকুলতাই তাঁর এই হেন ভক্ত সন্তানের জন্য বাড়ে। কিন্তু জগন্মাতা ভক্ত সন্তানের ব্যাকুল আহ্বানে যতই চঞ্চল হয়ে উঠেন না কেন,—তবুও তিনি ধরা দেন না সহজে। কেন না, সহজে ধরা দিলেই যে সব প্রাপ্তিই পূর্ণ হয়ে যায়।—আর এই প্রাপ্তি হয়ে গেলে তখন মা'য়ের জন্য আর কোন আকুলতাই থাকবে না। এই আকুলতা না থাকলে যে মা'য়ের নাম গান করার কথা ভুলে যেতে হয়। তাই ত সন্তানের আকুল কান্নায় জগন্মাতা বিগলিত হলেও: সন্তানকে না কাঁদিয়ে সহজে মুক্তি দেন না। আকুল কান্না না থাকলে যে মুক্তি মার্গের পথ উন্মুক্ত হয় না। তাইত অনেক জ্ঞানী-ঋষিরা বলে গেছেন,—মুক্তি-মার্গের পথ যদি উন্মুক্ত করতে চাও এবং ভগবৎ দর্শন লাভ করতে চাও,—আর সর্বশেষে জগন্মাতার অশেষ করুনা লাভের আশা কর তবে আকুল হয়ে কাঁদ: কাঁদার মত কাঁদতে যদি পার তবেই জগন্মাতা তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।

শুধু কি কান্নায় শেষ করবে?

না! তা' নয়! এ কান্নার মধ্যে আকুল হয়ে ডাকতে হবে। যেমন মাতৃহারা 'সন্তান' মায়ের জন্য আকুল হয়ে কাঁদেন তেমনি ভাবে।

তাই ত সাধক কবি রামপ্রসাদও তেমনি ভাবে আকুল হয়ে কাঁদেন। জগন্মাতার নামগান করতে করতে কাঁদেন।—শুধু একটি বার দর্শন করবার আশায়। এমনি ভাবে কাঁদতে কাঁদতে কখনো বা সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন!—আবার যখন চেতনা ফিরে পান, তখনই মাতৃনাম গানে আকুল হয়ে কাঁদেন।—

কিন্তু, কোথায়?

দয়াময়ীর এখনো ত দয়া হলো না?

এখনো ত জগন্মাতা দেখা দিলেন না!

অস্থির হয়ে উঠলেন রামপ্রসাদ। অস্থির হয়ে উঠে কাঁদতে থাকেন,

জগন্মাতার নাম গান করতে করতে 'দেখা দে মা, একবার দেখা দে' বলে !

তবে কি তাঁর এই আকুল কান্নাতেও জগন্মাতা দেখা দেবেন না ! পাষাণ মেয়ে কি শুধু পাষাণ হয়ে থাকবে। ভাবেন আর আকুল হয়ে কাঁদেন রামপ্রসাদ। আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আকুল কণ্ঠে ডাকেন, মা ! মাগো দেখা দে মা ! একটি বারের জন্য দেখা দে মা !

কিন্তু কৈ ? মা ত, এখনো দেখা দিচ্ছেন না !

একটা অজানিত অভিমানে রামপ্রসাদের মন ভরে ওঠে। আর সেই অভিমানে তিনি আবার বলতে থাকেন, না তোকে আর মা বলে ডাক্‌বো না ! তুই পাষাণের বেটি শুধু পাষাণ হয়ে থাক্ !— আর তোকে যতই ডাক্‌বো ততই তুই ডাকাবি এবং সঙ্গে সঙ্গে দিবি অশেষ যন্ত্রণা। এই অশেষ যন্ত্রণা দিতে তুই বেশ আনন্দ পাস। আর তারই সঙ্গে তোর নাম করাটাকে ভোলাতে চাস্ ! এই ভাবে রামপ্রসাদ নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু কিছুতেই মন প্রবোধ মানতে চায় না। বার বার যেন মন ব্যাকুল হয়ে উঠে মা'য়ের রাঙ্গা চরণ পাবার আশায়।

রামপ্রসাদের মন যতই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠুক না কেন, একটা অজানিত অভিমানে, রামপ্রসাদের মন ভরে থাকে। তাই অভিমান ভরে তিনি গাইতে থাকেন—

"মা মা বলে আর ডাক্‌বো না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা ॥
ছিলেম গৃহবাসী বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাবো, ভিক্ষা মেগে খাবো
মা বলে আর কোলে যাবো না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,

মা বিত্তমানে, এ দুঃখ সন্তানে,

মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥”

জগন্মাতার উপর অভিমান ভরে গাইতে থাকেন রামপ্রসাদ।— শুধু অভিমান নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আকুল কান্নায় কাঁদতে লাগলেন। আর তাঁর এই আকুল কান্নায় বুঝি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল স্তব্ধ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু রামপ্রসাদের এই অভিমান ভরা কান্নায়, এই আকুল ডাকে পাষাণী মায়ের আসন এতটুকুর জন্য বুঝি প্রকম্পিত হয়ে উঠল না। জাগল না জগন্মাতার পাষাণময় হৃদয়ে অভাগা সন্তানের জন্য এতটুকু কম্পন। যেন, পাষাণী মেয়ে পাষাণ হয়ে রইলেন। তাই ত মাতৃদর্শন লাভকারী অনেক ভক্ত সন্তান বলেছেন, মৃন্ময়ী পিঠে চিন্ময়ী রূপকে জাগাতে চাও, তবে ডাকার মত ডাক!— আকুল হয়ে মা বলে ডাক। তবেই দেখতে পাবে পাষাণের মধ্যেও করুণার সঞ্চার হয়েছে!

পাষাণী মেয়ে, যতই কঠিন পাষাণ হয়ে থাকুক না কেন, মাতৃ ভক্ত সন্তানের ক্রন্দনের জন্য তাঁকে একদিন না একদিন হার স্বীকার করতে হবে। সন্তানের আকুল ডাকে, আকুল কান্নায় সাড়া দিতে হবে। দেখা দিতে হবে ভক্ত সন্তানকে। তাইত রামপ্রসাদও আকুল হয়ে ডাকেন আর কাঁদেন। মা, মাগো! তুই কি একটি বারের জন্য দেখা দিবি না মা! দেখা দে মা, দেখা দে শুধু এক পলকের জন্য। তাঁর এই আকুল কান্নায়—তাঁর এই আকুল ডাকে বুঝি এবার জগন্মাতার আসন টলে উঠল।

তাই আপন ভক্ত সন্তানের আকুল আর্তনাদে আর স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। তা'ছাড়া স্থির হয়ে থাকবেনই বা কি করে? সন্তান যদি মা বলে আকুল হয়ে কান্না জুড়ে দেয়, তা' হলে মা কি চক্ষু-কর্ণের মাথা খেয়ে নীরব হয়ে থাকতে পারেন!

কি করেই বা থাকবেন পাষাণী মেয়ে পাষাণ হয়ে! তাইত মাতৃ ভক্ত সন্তানের আকুল কান্নায় জগন্মাতা আর পাষাণ হয়ে থাকতে পারলেন না।

রামপ্রসাদের আকুল কান্নায় একদিন সত্যি সত্যিই তাঁকে দর্শন দিলেন। পূর্ণ করলেন ভক্তের মনোবাঞ্ছা। আর যে মুহূর্তক্ষণে রামপ্রসাদ মাতৃরূপ দর্শন করলেন সেই মুহূর্তক্ষণেই তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। এবং জগন্মাতার অপরূপ রূপ মাধুরীর মহিমা কীর্ত্তনে, মাতৃনাম গানে জগৎ সংসারকে মাতিয়ে তুললেন। আর সেই দিন থেকে হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রামের অধিবাসীরা সবিস্ময়ে দেখলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে!—দেখলেন সদানন্দময় আত্মভোলা এক সাধককে। এবং আরো দেখলেন—মাতৃদর্শন লাভের পর থেকেই রামপ্রসাদ প্রায় সময় ভাব-সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। আর সেই ভাব সমাধিস্থের ভিতর দিয়ে তিনি এক মহানালোকের মাঝে যেন অন্তর্হিত হয়ে যেতেন।

॥ ৫ ॥

সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনালোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে—কবি সাংসারিক হলেও; সংসার তাঁকে কখনো মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি! কারণ, তাঁর জীবনের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ হাসি আর আনন্দ: সব কিছুই একমাত্র তারা-মায়ের অভয় পদে সঁপে দিয়ে—সব সময় নিজে আত্মহারা হয়ে থাকতেন। শুধু কি তাই! স্বীয় পত্নী সর্বাণী দেবীও স্বামীর এই আত্মভোলা ভাব দেখে আর ভাব সমাধির মাঝে ডুবে থাকতে দেখে ভয়ে এতটুকু ভীত হতেন না। কিংবা মায়ার সংসারের এতটুকু সংবাদ জানিয়ে তাঁকে অত্যুক্তি করে তুলবার চেষ্টা করতেন না।

শুধু আত্মভোলা স্বামীকে সকল বিপদে-আপদে রক্ষা করবার জন্য একমাত্র অভয়ার অভয় পদে প্রার্থনা জানাতেন নীরবে! আর রামপ্রসাদ? রামপ্রসাদ কিন্তু তার কোন সংবাদই রাখতেন না। তা'ছাড়া—রাখবেনই বা কি করে?

মন সব সময় জগন্মাতার অভয় পদের আশায় ভরে রয়েছে তিনি কি করেই বা ক্ষুদ্র মায়ার সংসারের সংবাদ রাখবেন? রাখতে পারেন না। রামপ্রসাদও মায়ার সংসারের কোন সংবাদ রাখতে পারেন নি। শুধু আত্মগতভাবে জগন্মাতার নাম গানে আত্মহারা হয়ে থাকতেন রামপ্রসাদ!

"মা আমার অন্তরে আছে!
(তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা)॥"

অন্তর বাসিনী শ্যামা মায়ের নামগানে জগৎ সংসারকে মাতোয়ারা করে দিয়ে রামপ্রসাদ ভাবাবেগে উদাত্ত স্বরে গাইতে থাকেন। গাইতে থাকেন অন্তর বাসিনী শ্যামা মায়ের বন্দনা। আর তাঁরই বন্দনা গানে তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বরে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় স্নিগ্ধ প্রভাতী মারুত হিল্লোল। স্তব্ধ হয়ে যায়—প্রভাতীর বন্দনা রত বিহগ কুজন। তারা স্তব্ধ হয়ে শোনে অন্তর বাসিনী শ্যামা মায়ের বন্দনা গান। ভাবোন্মাদ রামপ্রসাদ গাইতে থাকেন—

"মা আমার অন্তরে আছে!
(তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা)॥
তুমি পাষাণমেয়ে, বিষম মায়া, কতই মা কাচাও গো কাচ।
উপাসনা-ভেদে তুমি প্রধান মূর্তি ধর পাঁচ॥
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচা।
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥"

ভাবোন্মাদ রামপ্রসাদের কণ্ঠে যেন সব সময় একটা আকুলতার সুর জেগে ওঠে। জেগে ওঠে তাঁরই কণ্ঠে মাতৃনাম গানের মধ্যে। কিসের এক প্রেরণায় রামপ্রসাদের কণ্ঠে এমন সুর মাধুর্য নিঃসারিত হয়ে সামান্য সংসারী মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়কে জাগ্রত করে তোলে! ভাবেন তাঁরই পাড়ার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন আর পরিজনেরা।

ভাবেন আর স্তব্ধ হয়ে শোনেন, এবং শুনে শুনে তারা সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। অথচ তারা বুঝতে পারেন না যে কার এবং কিসের অনুপ্রেরণায় তাঁর কণ্ঠ থেকে এমন অমৃতময়, সুধাময় গান নির্ঝরিণীর ধারার মতন অবলীলাক্রমে নিঃসারিত হয়ে আসছে। প্রকাশিত হয়ে পড়ছে লীলায়িত ছন্দ রূপে।

আর তাঁর আত্মীয় স্বজন-পরিজন এবং পাড়ার প্রতিবেশীরা যখনই তাঁকে দেখতে পান, তখনই তারা দেখেন রামপ্রসাদের সমস্ত দেহ একটা উজ্জ্বল অথচ স্বর্গীয় দ্যুতিতে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তারা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারেন না, রামপ্রসাদের দেহের এই দ্যুতি কিসের? তাঁর দেহের এই দ্যুতি কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবের দ্যুতি, না অন্য কিছু, যতই ভাবেন রামপ্রসাদের আত্মীয় স্বজন আব পাড়ার প্রতিবেশীরা, তাদের সকল ভাবনাকে ছাপিয়ে দিয়ে একটা অজানিত আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেন একটা শ্রদ্ধা আর ভক্তির ভাব।

শুধু তাই নয়, একটা নম্রতার ভাব এসে আত্মভোলা সদানন্দময় রামপ্রসাদের চরণ প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে। তা'ছাড়া আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁরই কণ্ঠের মাতৃনাম গানে মনকে উদাস উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। কেন?—কেন এমন হয়? তাঁরা কেউ ভেবে ঠিক করে উঠতে পারেন না; তাদের মন কেন যে এমন হয়! কেন বার বার মনটা লুটিয়ে পড়তে চায় ওই আত্মভোলার চরণ প্রান্তে!

কিন্তু যাঁকে নিয়ে তাদের মনে এই দ্বন্দ্ব খেলা চলে; যাঁকে নিয়ে তাদের এই ভাবনা-চিন্তা অথচ তিনি কিছুই জানতে পারেন না। জানতে পারেন না আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদের মনের খবর। জানবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না রামপ্রসাদ। শুধু নিজের ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন—আর নিজের ভাবেই মাতৃনাম গান বাঁধেন।—

"এবার বাজি ভোর হলো।
ও মন কি খেলা বল॥

শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটি বিপাকে মলো॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হলো॥
দুখান তরী নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে অবশেষে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণার ঘরে পীলের কিস্তি মাত হ'ল॥"

... ...

আপন ভাবে বিভোর হয়ে আপনিই গান বাঁধেন রামপ্রসাদ। গান বাঁধেন সর্ব দুঃখ হারিণী মায়ের নামে। অর্থাৎ জগন্মাতার নামে। গান বাঁধেন আর উদার কণ্ঠে সেই মাতৃনাম গাইতে থাকেন। সংসারের কোন সংবাদটি রাখেন না। তা ছাড়া রেখেই বা কি হবে! সংসার, সংসার ত নয়, শুধু মায়াব জাল। এই মায়ার জালে নেই সুখ, নেই শান্তি। সারেব সন্ধান এই হেন মায়ার সংসাবে পাওয়া যায় না, শুধু অসারের অসাবত্ব। সেই অসারত্ব থেকে মোহ মুক্ত হয়ে নাম-গানে আত্মসমাহিত হয়ে থাকেন রামপ্রসাদ।

নিজের জীবনেব সুখ-দুঃখ সব কিছুই ওই সর্ব দুঃখ হারিণীর চরণ তলে বিসর্জন দিয়েছেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকেই তারামায়ের চরণ তলে সঁপে দিয়েছেন। তবে আব কেন অসাব সংসারের সংবাদ রেখে মাতৃনাম গান করাব থেকে, মায়েব রাঙা চবণ লাভের আশা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন। যার যা গরজ সে তা করুক গে। সংসারের খবরাখবর নিয়ে মরুক।

তা ছাড়া তাঁরই পূর্ববর্ত্তী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভারত ভাস্কর পরম ব্রহ্মবাদী আচার্য শঙ্করই ত বলে গেছেন, 'কা তব কান্তা কস্ত পুত্রঃ'। অর্থাৎ কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র। এই জগৎ সংসারে একমাত্র তুমিই তোমাব। কিন্তু রামপ্রসাদ ভাবেন অন্য কথা। ভাবেন এই জগৎ জোড়া রয়েছে এক বিশ্ব সংসার। এবং এই বিশ্ব সংসার যাঁর,

এবং যিনি এই বিশ্ব সংসার পেতে রেখেছেন ; তিনিই দেখুক গে তাঁর এই পাতা সংসার। আমি শুধু নিমিত্ত হয়ে মাকে ডাকি, মায়ের নাম গান করি।

কেবল, নিমিত্তানিচঃ !

এরই নিমিত্ত হয়ে জগন্মাতার রাঙা চরণ দু'খানি পাবার জন্য, তাঁর এই রাঙা চরণ দু'খানি ধরবার জন্য শুধু কেঁদে মরি। তাই ত মা ! মা ! বলে আকুল হয়ে ডেকে মরি।

আর সেই কারণেই ত রামপ্রসাদ মায়ার সংসারেব মায়ার বন্ধন বিশ্ব-নিয়ন্ত্রীর পদতলে সঁপে দিয়ে আকুল হয়ে কাঁদেন ; অভিমান করেন জগন্মাতার উপব, আবার কখনো কখনো গালি দেন পাষাণী মেয়ে বলে। এবং কখনো বা দুঃখ জানিয়ে বলতে থাকেন—

"মা আমায় ঘুরাবে কত ?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত ॥
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমি পশুপক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবাবণ যাতনাতে হলেম হত ॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, ত'রে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয় পদ ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো ত।
(প্রসাদ যে কুপুত্র তোমার করে রেখ পদানত ॥)
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥"

কিন্তু, এত করে এমনি ভাবে আকুল হয়ে মাকে ডেকে রামপ্রসাদের মন ভরে ওঠেনা। আর ভরে উঠবেই বা কি করে ! 'বদন ভরে' মা'কে একবার মাত্র দর্শন করেছেন। আর এই একবার দর্শনেই অশান্ত

মনের শান্তনাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন? না! তা রামপ্রসাদ পারেন নি। তাছাড়া পারবেনই বা কি করে। যাঁর মন বার বার মা'কে দর্শন করবার জন্য, একান্ত করে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে—তাঁর পক্ষে একটি বার দর্শনই কি যথেষ্ট! তাই ত তাঁকে বার বার কেঁদে মরতে হচ্ছে।

যেন তাঁর এই কান্নার শেষ নেই। নেই কোন আদি-অন্ত।

অনন্ত কাল ধরে এমনি তরো কান্না কাঁদতে না পারলে বুঝি মা'কে আপন করে পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদের সমস্ত অন্তর জুড়ে শুধু এরই জন্য কান্না। শুধু মাকে পাবার জন্য অর্থাৎ জগন্মাতাকে পাবার জন্য।

মাতৃনাম গান করতে গিয়ে কাঁদেন রামপ্রসাদ। শুধু কি তাই, জগন্মাতার উপর অভিমান করতে গিয়েও জুড়ে দেন কান্না। ক্রোধ ভরে গালা-গালি করতে গিয়েও মায়েব জন্য আব এক কান্না কাঁদতে হয়। তাইত বামপ্রসাদের বহু পববর্ত্তী কালে, দক্ষিণেশ্ববের পাগল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সময় সময় তাঁর ভক্ত-শিষ্যদেব বলতেন, "ওরে কাঁদ! কাঁদ! কাঁদতে যদি হয় মায়েব জন্য কাঁদ! সংসারের জন্য, ভোগ-বাসনার জন্য, অর্থ-কাম-যশেব জন্য কাঁদবি না। এক মাত্র মায়ের জন্যই কাঁদবি। কাঁদাব মতন কাঁদবি! আকুল হয়ে কাঁদবি, আর এই কান্নার মধ্যে আদি-অন্ত কিছুই বাকী রাখবি না।" একটুখানি থেমে আবার বলতেন,—"মাকে পাবার জন্য মা'কে দেখবার জন্য—আর মায়ের কোলে উঠবার জন্য যদি কাঁদিস, তবে ভোগ-বাসনা, অর্থ-কাম, যশ ও আদি-অন্ত সব একাকার করে দিয়ে কাঁদবি। কিছুটির দিকে ফিরেও তাকাবি না। তবেই ত 'মা' তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।" তারপরেও আবার বলেছিলেন, "নেই-আকৃড়া ছেলে দেখেছিস ত। মা'কে পাবার জন্য, মায়ের কোলে উঠবার জন্য কেঁদে কেঁদে যেমনটি বায়না করে, তেমনটি করে কেঁদে কেঁদে মা'কে পাবার জন্য—মা'কে দেখবার জন্য বায়না কর। তবেই দেখতে পাবি, ওই পাষাণের বেটী, পাষাণ হয়ে থাকতে পারবে না। মৃণ্ময়ী

পীঠে চিন্ময়ী হয়ে উঠবে। এসে দাঁড়াবে তোরই সামনে। আর তার দু'হাত বাড়িয়ে তোকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দেবে।" আর—

রামপ্রসাদ কাঁদেন এমনি তরো। তাঁর এই কান্নার যেমনি আদিও ছিল না, তেমনি অন্তও ছিল না। এবং তাঁর এই কান্নার ভিতর দিয়ে অভিমান করে বলতেন—মা বলে আর তোকে ডাকব না। বলেই, আবার কখনো বা এই বলে কাঁদতেন—আমি এত দোষী কিসে, ঐ যে প্রতি দিন হয়, দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে বসেই!

॥ ৬ ॥

রামপ্রসাদের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই রয়েছে।

এই অভাব অনটনের ফলে সময় সময় স্ত্রী সর্বাণী দেবী বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েন। কিন্তু, আত্মভোলা স্বামীকে এই অভাব-অনটনের কথা জানিয়ে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে একটা অজানিত সংকোচ অনুভব করতেন সর্বাণী দেবী।

তাই বুঝি সর্বাণী দেবী তাঁর অন্তরের সমস্ত আকুতি, তাঁর অন্তরের করুণ মিনতি জানান, সর্বদুঃখহারিণী মহামায়ার চরণে। কেন না এক মাত্র জগন্মাতা মহামায়া ভিন্ন উপায়ান্তর বা কি। যাঁর নাম গানে স্বীয় স্বামী ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে থাকেন, সে পাষাণের বেটীর কাছে যদি তাঁর অন্তরের আবেদন না জানান, তবে কার কাছেই বা জানাবেন। যাঁরা সংসারের মায়া মোহান্ধকারে 'পাকে' পড়ে অহরহ ঘুর পাক খেয়ে মরছে, তবে কি তাদের কাছে জানাবেন?

না, তা কখনো নয়! মনকে দৃঢ় করে নেন সর্বাণী দেবী। তাঁর সংসারের অভাব-অনটনের কথা তাদের কাছে জানাবেন না। কখনো না! তাঁর অন্তরের যত আবেদন-নিবেদন জানাবেন—একমাত্র মোহান্ধ বিনাশকারিণীকে, জগৎপালয়ত্রী, জগদ্ধাত্রীকে। মা, মাগো তোর দেওয়া এই ভবের সংসার, তুই বুঝে নে মা।

এমনি নীরব আবেদন জানান সর্বাণী দেবী।

আবেদন জানান একমাত্র জগন্মাতার কাছে।

কিন্তু রামপ্রসাদ যেমনি নির্বিকার, তেমনি নির্বিকার ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে নিজের দেহ-মনকে জগন্মাতার পায়ে লীন করে দিতে চান। কিন্তু তাও আব পারেন কৈ ! সময় সময় তপস্যা ক্ষেত্র থেকে, সাধনার চরম স্থান থেকে নেমে আসতে হয়। এবং ফিরে আসতে হয় মায়ার সংসারে। ফিরে আসতে হয় একমাত্র গর্ভধারিনী মা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর জন্য।

সিদ্ধেশ্বরী দেবী, স্বীয় গর্ভজাত সন্তান রামপ্রসাদের এই ভাব উন্মাদনা, ভাব সমাধি, আর যোগ-সাধন-ভজনের কথা কিছুই বুঝতে চাইতেন না। ঝতে চাইতেন না মাতৃ স্নেহের বশে এবং যখনই তাঁকে এই মায়ার সংসারে দেখতেন তখনই তিনি একটা হা-হুতাস, একটা অজানিত আক্ষেপ প্রকাশ কবে বসতেন।

শাশুড়ীর এই হা-হুতাস, এই আক্ষেপ দেখে, শাশুড়ীর মনকে শান্তনা দেবার জন্য সবাণী দেবী বলতেন, 'মাগো, আপনি আপনার ছেলের জন্য অনুতাপ বা আক্ষেপ করছেন কেন ? আপনি ত জানেন আপনাব ছেলে, এই মায়াময় সংসারের লোক নন। তাঁকে এই সংসারের পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে আমরাই বা পাপের ভাগী হতে যাব কেন মা। আব কেনই বা তাঁর সাধন-ভজনে বিঘ্ন ঘটাবো !'

পুত্রবধূ সর্বাণী দেবীর কথার প্রতিবাদ জানাতে যান সিদ্ধেশ্বরী দেবী। কিন্তু চিবসহিষ্ণুতা পরায়ণা সাধ্বী নারী ছিলেন সর্বাণী দেবী। তাই শাশুড়ীর প্রতিবাদে সহাস্যে বাধা দিয়ে বলতেন—'মা সাধক মাত্রই সংসাবের সকল মায়ার বন্ধন কাটান এবং সংসারের মায়ার বন্ধন কাটিয়ে ধীরে ধীরে সাধনার পথে এগিয়ে যান। এগিয়ে যান উর্দ্ধালোকের দিকে ! আর সেই উর্দ্ধালোকের থেকে স্ত্রী-পুত্রের দোহাই দিয়ে কিংবা আপনার ভোগ বাসনা কামনার জন্য, তাঁকে যদি নিম্নে অর্থাৎ এই ভব সংসারের পঙ্কিলতার মধ্যে নামিয়ে আনা হয়, তা হ'লে জগন্মাতার কাছে দোষী হতে হয় মা

সাধকের সাধন পথ থেকে পতন ঘটিয়ে কোন নারীই সুখ-লাভ

করতে পারে না। সে জন্যই বলছিলাম মা তাঁর এই সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি না করে বরঞ্চ যাতে তিনি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, তাঁরই জন্য জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা জানানো অনেক শ্রেয়।

সিদ্ধেশ্বরী দেবী পুত্রবধূর কথায় কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করলেও, আশু সন্তান বিরহটাই যেন বিশেষভাবে অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর এই সন্তান বিরহটাই ক্রমে ক্রমে এত তীব্র হয়ে উঠতে লাগল যে, তা আর সহ্য করে উঠতে পারছিলেন না।

তাই সিদ্ধেশ্বরী দেবীর শরীর ও মন যেন ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে লাগল। এবং তাঁর শরীর ও মন যতই ভেঙে পড়তে লাগল, ততই তিনি আকুল হয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন জগজ্জননীর কাছে; তাঁর এই ক্ষেপা ছেলে, পাগল ছেলে রামপ্রসাদের জন্য। সন্তান বিরহ বিধুরা জননীব এই আকুল প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কিছু করবারই বা শক্তি কৈ! একমাত্র কালের মাঝে সঁপে দিয়ে মহাকাল রূপী মহামায়াকে কলা দেখানো ভিন্ন অন্য পথই বা কি? সন্তান বিরহিনী জননী, মহাকাল রূপী মহামায়াকে যতই কলা দেখান না কেন, জগজ্জননী মহামায়ার তাতে কিছু যায় আসে না। শুধু দুর্বল মুহূর্তেব করুণ প্রার্থনাটাই জগন্মাতার কাছে শ্রেয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই জগন্মাতা সন্তান বিরহিনী মাতাব এই সন্তান বিরহেব জ্বালা দীর্ঘ দিন ধরে সহ্য করতে দিলেন না! তাঁর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনাব হাত থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিলেন সর্বদুঃখহারিনী জগন্মাতা।

গর্ভধারিনী জননীর মৃত্যুতে রামপ্রসাদ যেন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আলো দেখতে পেলেন। আর রামপ্রসাদ এই মায়ার বন্ধন মুক্তির আলোর সন্ধান পেয়ে তাঁর জীবন মন সর্বস্ব সঁপে দিলেন ধ্যান-তপস্যা বা কঠোর সাধনার মধ্যে।

আর সর্বাণী দেবী?

সর্বাণী দেবী শাশুড়ীর মৃত্যুতেই ভেঙে না পড়ে আগামী দিনের এক কঠোর অগ্নি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। আর তারই সাথে সাথে ভাবতে লাগলেন, আগামী দিনের এই কঠোর অগ্নি

পরীক্ষায় তিনি কি করে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু কি করে উত্তীর্ণ হবেন, তা কিছুই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারলেন না। তবুও নিজের উপর এবং নিজের মনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আর মনে মনে জগন্মাতার 'শ্রীচরণ' স্মরণ করে, সংসারের গুরুভার নিজের মাথার উপর তুলে নিয়ে, আগামী দিনের অগ্নি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। তা'ছাড়া না নিয়েই বা উপায় কোথায়?

সদা আত্মভোলা স্বামী, সংসারের কোন ধারই ধারেন না। সব সময়ে মায়ের নাম গানে, মায়ের ধ্যান-তপস্যায় বিভোর হয়ে থাকেন। অথচ সংসারে হাজার অভাব-অনটন এলে তার দিকে ফিরে তাকাবেন, কিংবা এই অভাব অনটনকে দূর করবার চেষ্টা করবেন, তারই যেন কোন খুরসুৎ নেই। তাই ত সর্বাণী দেবীকে নিজের হাতেই এই গুরু দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে হয়েছে। তাছাড়া একদিন যাঁরা তাঁদের সুসময়ে এসে দাঁড়াত, আজ তাঁদের এই দুঃসময়ে তারা সকলেই দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই যেন ক্ষণিকের অতিথী হয়ে এসেছিল, আনন্দ উপভোগ করল, আর যেই আনন্দের রসের ভিয়ান ফুরিয়ে গেল অমনি যে যার স্থানে চলে গেল। চলে গেল উদ্দাম জলের স্রোতের মতন।

অর্থাৎ নদীর জোয়ার আসবার ক্ষণে উদ্দাম জল স্রোত যেমনি ছুটে আসে, ছল-ছল্ ছল্লাৎ,—কল্-কল্, আনন্দের কল-কোলাহল ধ্বনি করতে করতে তেমনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এরাও সুসময়ের অতিথী রূপে আনন্দের কল ধ্বনি তুলে আসে। আবার জোয়ারের জল যেমন ভাঁটার টানে কুলু-কুলু, কুলু ধ্বনিতে তীব্রবেগে নিচের দিকে নেমে যায় তেমনি এরাও অসময়ে দূরে সরে দাঁড়ায়। এমন কি তাদেরও করবার মতন কিছুই থাকে না।

সর্বাণী দেবীও এর সব কিছুই বুঝেন, সব কিছুই জানেন। তাই কাকেও কোন অপরাধী না করে কিংবা কারো উপর কোন দোষারোপ না করে নীরবেই দেখে যান!

আর রামপ্রসাদ?

রামপ্রসাদ—এই ভবের সংসারের কোন সংবাদই জানতে পারলেন না। এমন কি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মায়ার জীবদের বিষয়ে কোন আগ্রহও প্রকাশ করলেন না। শুধু অনন্তের মাঝে জগন্মাতার যে মুক্ত আসন পাতা রয়েছে, সে আসনে জগন্মাতার ধ্যানে সমাসীন হয়ে রইলেন!

সর্বাণী দেবী যেদিন এই সংসাবের গুরুভার মাথায় তুলে নিলেন, সেই দিন থেকে তিনি পলে পলে বুঝতে পারলেন যে, এই ভবের সংসারের গুরু দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়ে তা বহন করে নিয়ে যাওয়া বড় কঠিন কাজ।

কিন্তু যত বড় কঠিন কাজই হোক না কেন, তবুও তাঁকে তা বহন করতেই হবে। কেন না এই সংসারের গণ্ডীর মধ্যে মাতৃঅন্ত প্রাণ স্বামীকে সংসারে পঙ্কিলতার সংবাদ জানিয়ে পঙ্কিলময় মায়ার সংসারে আবদ্ধ করতে পারবেন না।

তাই স্বীয় স্বামী বামপ্রসাদের তপস্যা, জপ-তপ, ধ্যান সাধনাকে ভঙ্গ করবার জন্য এতটুকু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন না।

একমাত্র জগজ্জননী মহামায়া মহাশক্তির উপর জীবন-মন সর্বস্ব সঁপে দিয়ে কখনো অনাহারে আবার কখনো বা অর্দ্ধাহারে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

এমনি করেই সর্বাণী দেবীর দিন অতিবাহিত হয়ে যায়।

দিন অতিবাহিত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আসে রাত্রি। তারপর রাতের অবসানে নবীনালোক প্রসারিত করে দিয়ে আবার সূচিত হয় দিনের। কিন্তু এই দিবা-রাত্রির আসা-যাওয়ার খেলার মধ্যেই সর্বাণী দেবীর দিন অতিবাহিত হয় অভাব অনটনে। আর এই অভাব অনটন শত বাহু মেলে তাঁকে গ্রাস করবার চেষ্টা করলেও তিনি এতটুকু বিচলিত হলেন না। বরং এই অভাব অনটনকে নির্বিকার ভাবে মেনে নিয়ে, দিনের পর রাত, রাতের পর দিনকে অতিবাহিত করে দিতে লাগলেন। তেমনি সময়ে হঠাৎ একদিন রামপ্রসাদ তাঁর সাধন ক্ষেত্র থেকে স্বগৃহে ফিরলেন। এবং স্বগৃহে ফিরে এসে স্ত্রী

পুত্র-কন্যাদের-মুখের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলেন যে, কত কষ্টের ভিতর দিয়ে এই স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছে। অথচ স্ত্রী সর্বাণী দেবী কঠোর সংযমের সঙ্গে সমস্ত দুঃখ,-দুর্দশা, জ্বালা, ব্যথাকে দেবীর মতন সহ্য করে যাচ্ছেন। রামপ্রসাদ এই কথা-গুলি ভাবতে গিয়ে সেই মুহূর্তক্ষণে অন্তর বাসিনী জগজ্জননী শ্যামা মায়ের আসনে সর্বাণী দেবীকে না বসিয়ে মনকে স্থির করতে পারলেন না।

সর্বাণী দেবীকে দেবীর আসনে বসিয়ে অন্তর বাসিনী শ্যামা মাকে অন্তরের আকুল আবেদন জানালেন রামপ্রসাদ। আর জানালেন সংসারের অভাব অনটনের কথা।

রামপ্রসাদ আকুল আবেদন জানাতে সেদিন তাঁদের সংসারে এক অত্যাশ্চর্যরূপ দেখা গেল। অর্থাৎ তাঁর আবেদনে সেদিন তাঁদের ক্ষুধার আহারের সংস্থান হয়ে গেল।

এই ভাবে হঠাৎ রামপ্রসাদের পরিবর্তন হতে দেখে গাঁয়ের অনেক প্রাতবেশী বিস্মিত হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার পর রামপ্রসাদ আরো দু'চার দিন স্বগৃহে রইলেন এবং নানা বিষয় কর্মের দিকে মন দেবার জন্য চেষ্টা করলেন। অথচ কিছুতেই এই মায়াময় সংসারের বিষয় কর্মের মধ্যে মনস্থির করতে পারলেন না। যেন জগন্মাতা তাঁর সমস্ত মায়াবন্ধনের বিষয় কর্মের থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাই রামপ্রসাদ তারই জন্য মনে মনে একটা অজানিত আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। এবং এই বিষয় কর্ম করতে পারলেন না, কিংবা মন দিতে পারলেন না বলে এতটুকু আক্ষেপ বা অনুশোচনা তাঁর মনের মধ্যে স্থান পেল না।

এই অনুশোচনা মনের মধ্যে স্থান পেল না বলেই মুক্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, "ইচ্ছাময়ী তারা মা যদি ইচ্ছা করেন তা'হলে সকল বন্ধন ঘুচিয়ে দিতে পারেন!"

আবার ইচ্ছা করলে সংসারের মায়ার বন্ধনে ফেলে কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতন সংসারের পাকে পাকে ঘোরাতেও পারেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই রামপ্রসাদ আবার তাঁর সাধন পীঠে ফিরে যান।

আর সর্বাণী দেবী ?

রামপ্রসাদ তাঁর সাধন পীঠে প্রত্যাগমন করার পর, সর্বাণী দেবী পূর্বেরই মতন দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটন সহ্য করে সংসার নির্বাহ করতে লাগলেন।

॥ ৭ ॥

সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনালোচনা করতে গিয়ে, তাঁর ভক্তিময় জীবনেব অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা আমরা শুনে আসছি। কিন্তু সেই সব অলৌকিক ঘটনাবলী কতদূর সত্য আর কতদূব মিথ্যা তার বিচার বিশ্লেষণ করবার মত এখনো সময় আসেনি। এবং আদৌ আসবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কারণ কালের প্রবাহে যখন সনাতন হিন্দু ধর্ম কালেব স্রোতে ভেসে চলে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে, ঠিক তেমনি সময়ে মহামায়া মহাশক্তির রূপ ধারণ করে সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর বিভূতিচয় দিয়ে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন এক শক্তি সৃষ্টি করে এই পৃথিবীব মাঝে প্রেরণ করেন।

প্রেরণ করেন ঐতিহ্যময় সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করবার জন্যই। আর এই শক্তিই সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য তাঁদের জীবনে লৌকিক অলৌকিক নানা ঘটনা প্রকাশিত হতে থাকে। এবং এই অলৌকিক ঘটনাগুলিতে সামান্য সংসারী মানুষেরা বিস্ময়াভূত হয়ে যেতো। আর তারই সঙ্গে সঙ্গেই তারা একথাও ভাবতে থাকে, এই সব অলৌকিক ঘটনাগুলি শুধু ঘটনা নয়; এ অতি ধ্রুব সত্য'। 'আর এই ধ্রুব সত্যটাই বাস্তব জগতে

অনির্বাণ শিখার মতন আবাহমান কাল ধরে প্রকাশিত হয়ে কীর্ত্তি গৌরব ঘোষণা করে থাকে। এবং সেই সব কীর্ত্তি গৌরবের কথাকে বর্তমানের জীবনীকার দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করেন।

কেন না অলৌকিক শক্তি ভিন্ন কোন সাধকের জীবন গঠিত হয় না। তাছাড়া আবাহমান কাল ধরে যা সত্যরূপে প্রচারিত হয়ে আসছে, তাকে মিথ্যা, কিংবা একটা কাল্পনিক ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেন না তার কারণও যথেষ্ট আছে; সেই কারণগুলিকে অযথা উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করে, বর্তমানের রামপ্রসাদের জীবনীকার, এই সাধক কবির ক্ষুদ্র জীবনাখ্যানকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে অনিচ্ছুক। জগন্মাতা মহামায়ার অভিপ্রায়ে আজ যাঁর জীবন কথিকা প্রণয়ন করতে প্রয়াসী হয়েছি; কেবল মাত্র তাঁরই জীবনের লৌকিক অলৌকিক ঘটনাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে, তারই সম্যক পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। কেবল মাত্র চেষ্টা।

অতএব, সেই চেষ্টাই করা যাক।

রামপ্রসাদের জীবনে অনেক লৌকিক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, তার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু সেই সব লৌকিক অলৌকিক ঘটনাগুলির পুনরালোচনা করতে বসলে প্রথমে আমাদের মনে পড়ে রামপ্রসাদের মাতৃনাম গানের কথা। কেন না, আত্মসমাহিত ভাবে যখন রামপ্রসাদ মহামায়া মহাশক্তির নাম-গানাঞ্জলী নিবেদন করতেন তখন তাঁর সেই নামগানাঞ্জলীতে সমস্ত জগৎ সংসারকে একটা ভক্তিময় রসামৃতে মাতিয়ে তুলতেন।

এমন কি মহামায়া মহাশক্তির নামগানাঞ্জলী শুনে অনেকেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেত। শুধুই তাই?

আবার যখন ভোরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে উদার-উদাস স্বরে মাতৃনাম গানাঞ্জলী গাইতেন তা শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ ও অভিভূত হয়ে যেত পুণ্যাখাঙ্ক্ষিণী স্নানার্থীরা। এমন কি তাঁর উদার উদাস কণ্ঠের মাতৃনাম গান শোনবার জন্য বহু লোক ভাগীরথীর তীরে এসে

জমায়েত হতে থাকতেন। এমন কি তাঁদের মধ্যে অনেক স্নানার্থী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতে অবগাহনের কথা ভুলে যেত সদা আত্মভোলা রামপ্রসাদের কণ্ঠে মাতৃনাম গান শুনতে শুনতে।

এক একদিন আত্মভোলা রামপ্রসাদের মাতৃনাম গান শোনবার জন্য ভাগীরথীর তীরে এত লোকের সমাগম হত যে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে তিল ধারণের স্থান পর্যন্ত থাকত না।

কিন্তু আত্মভোলা রামপ্রসাদ ?

রামপ্রসাদ আত্মসমাহিত ভাবে, ভাগীরথীর এক বুক জলের মাঝে দাঁড়িয়ে, উদার উদাস ভাবে গাইতেন। আর তাঁরই কণ্ঠের সেই মাতৃনাম গান কে বা কারা দাঁড়িয়ে শুনছে সেই দিকে তাঁর খেয়ালও পর্যন্ত থাকত না। এবং সেইদিকে খেয়াল থাকত না বলেই, শুধু ভাবাবেগে মাতৃনাম গান করে যেতেন।

রামপ্রসাদ কখনো বা গাইতেন—

"ডুব দেরে মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥"

আবার—

কখনো কখনো বা উদার উদাস কণ্ঠে গাইতেন—

"দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ বসনা॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্বাণে কি গুণ বল না॥

রামপ্রসাদ এমনি ধারা নিত্য-নৈমিত্তিক মাতৃনাম গান করতে করতে অবগাহন করতেন। আর তাঁরই কণ্ঠে মাতৃনাম গান শোনবার অভিপ্রায়ে যারা ভাগীরথী তীরে এসে ভীড় জমাত এবং স্নানার্থীরা

যাঁরা স্নানের জন্য ভাগীরথী বক্ষের উপর নামানো ঘাটে এসে জমায়েৎ হ'তো, তাদের সকলের বাক্‌শক্তিকে স্তব্ধ করে তাদেব মনকে বিমুগ্ধ ও উদাস করে তুলতেন। শুধু কি তাই ?

কল কল, কলনিনাদিনা ভাগীরথী তার কল্ কল্ শব্দকে স্তব্ধ করে দিয়ে, একটা তরঙ্গের সমারোহ সূচনা করে সানন্দে সাধক কবিকে অভ্যর্থনা জানাত।

ভাগীরথী তরঙ্গের মালা রচনা করে সাধক কবির মাতৃনাম গানের সুরের মায়াজালকে দূর থেকে দূরে বয়ে নিয়ে চলে। যেন মাতৃনাম গানে আত্মহারা হয়ে স্বয়ং ভাগীরথী মাতৃনাম গানের সাধককে অভিনন্দিত করছেন।

আজ আমরা যে সময়ের কথা বলতে বসেছি তা আজ থেকে অনেক অনেক বছর পূর্বেকার কথা। তখন সারা বাংলা দেশের সনাতন হিন্দু ধর্মের উপর একটা গ্লানির ছাপ দৃঢ় ভাবে পড়ে। এই সনাতন হিন্দু ধর্ম ও কৃষ্টিকে যখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলছিল ঠিক তেমনি সময়ে আবির্ভূত হলেন রামপ্রসাদ।

মাতৃনাম গানে পাগল, মায়ের চরণ দর্শনের আশায় আকুল হয়ে এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম ও কৃষ্টিকে রক্ষা করবার জন্য, মাতৃ প্রেমে, মাতৃনাম গানে সনাতন হিন্দু ধর্ম ও কৃষ্টিতে অবিশ্বাসী প্রাতটি নব-নারীর মনকে উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন। রোপণ করেছিলেন একটা দৃঢ় বিশ্বাসের বীজ। জানিয়েছিলেন, সনাতন হিন্দু ধর্ম ও কৃষ্টির ঐতিহ্যময় বাণীকে। আর জগন্মাতার অপার মহিমা, অশেষ করুণার কথা, মাতৃনাম কীর্ত্তনের ভিতর দিয়ে পাপাত্মা পাপ সন্তপ্ত জগৎ সংসারের প্রতিটি জীবকে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন মুক্তালোকের দিকে।

* * *

সে দিন প্রভাতী আলোর রেখা ফুটি ফুটি করেও ফুটে ওঠেনি। শুধু একটা আলো-আঁধারি, আলো-ছায়ার এক মন মোহনিয়া রূপের

স্নাত করে আগত প্রভাতের বন্দনা গানের সবেমাত্র আয়োজন চালিয়েছে। আর প্রভাতী সূর্যের দূত কয়েকটা বিহগ মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠে, নিজেদের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই প্রভাত ফুটে ওঠার পূর্বক্ষণে, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নানের ঘাটে তখন স্নানার্থীদের বেশ ভীড় জমে উঠেছে। কেন না, তখন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর আকণ্ঠ জলের মাঝে দাঁড়িয়ে সদা আত্মভোলা রামপ্রসাদ! মাতৃনাম গানে পাগল রামপ্রসাদ উদাস কণ্ঠে মাতৃনাম গান করে চলেছেন—

"মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ ॥
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ-কোকনদ,
কালেরে নিরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্ধ যাম আনন্দেতে সুখে থাক ॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক ॥"

রামপ্রসাদের উদার উদাস কণ্ঠস্বর, তরঙ্গায়িত ভাগীরথীর তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলে দূর হতে দূরান্তে ছুটে চলেছে আর সেই সঙ্গীতের মন মোহনিয়া সুরের মূর্চ্ছনা পুণ্যকামী ভাগীরথীর স্নানার্থীরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে শুনছে। শুনছে 'মনরে শ্যামা মাকে ডাক্'। আর সেই মাতৃনাম গান স্তব্ধ হয়ে শুনছেন ভাগীরথীর বক্ষের উপর ভাসমান পানসির মধ্যে বসে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। শুনছেন তিনি সেই মাতৃনাম গান বড় ব্যগ্র ভাবে।

জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব শুনতে পেলেন এক নূতন আশার বাণী। শুনতে পেলেন পলায়মান হতভাগ্য নবাব। তাই তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরই ভাসমান পানসির মাল্লাকে, মাঝি এই গান কে গাইছে?

মাঝি তার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বললে, এক পাগল আদমী জলের মাঝে দাঁড়িয়ে গান করছে জনাব।

পাগল! বিস্মিত দৃষ্টি তুলে তাকালেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পানসির মাল্লার মুখের দিকে। তারপর ধীর অথচ প্রশান্ত স্বরে বললেন, না। এ কোন মতে পাগল হতে পারে না। খোদাবন্দ এই আদমীকে পাগলের মতন করে পাঠালে কি হবে, এই আদমী সাচ্চা আদমী আছে। যেন স্বগতঃভাবে কথাগুলি বলে গেলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তারপর আপন পানসির মাল্লার মুখের দিকে তাকিয়ে পুনশ্চ বললেন, ওই পাগল আদমীকে একবার পানসিতে তুলে নাও ভাই। ওরই কণ্ঠে দুটো গান শুনে মনটাকে একটু শান্ত করে নিই।

—যো হুকুম জনাব! বলেই পানসির মাল্লা ধীরে ধীরে পানসি রামপ্রসাদের কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে, রামপ্রসাদকে আহ্বান জানাল পানসিতে উঠবার জন্য।

আত্মভোলা রামপ্রসাদ পানসির মাল্লার এই সাদর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। উপেক্ষা করতে পারলেন না বলেই পানসিখানা তাঁর আরো কাছে আসতেই, তাতে তিনি উঠে পড়লেন। কিন্তু তার পূর্বে তিনি এতটুকুও ভাবতে পারলেন না যে, এ কার পানসি? কোথা থেকে এই পানসি আসছে আর কোথায় বা যাবে, এবং কেনই বা তাঁকে উঠবার আহ্বান জানাল। আর ভাবতে পারেন নি বলেই দ্বিধাহীন ভাবে তিনি পানসিতে উঠে পড়লেন।

পানসিতে উঠেও রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন না, এই পানসি কার।

যখন পানসিতে উঠলেন, এবং সামনা-সামনি পানসির মালিককে দেখলেন, তখনই বুঝতে পারলেন এই পানসিখানা কার। বুঝতে পারলেন, সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব, নবাব আলীবর্দী খাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার। আরো বুঝতে পারলেন যে, পলাশীর যুদ্ধে তাঁর পরাজয়ের ফলে এবং একদিন যাঁরা

হয়ে দীন বেশে পানসিযোগে পলায়ন করছেন পূণ্যতোয়া ভাগীরথীর উপর দিয়ে। আর ঠিক তেমনি সময়ে রামপ্রসাদ ভাগীরথীর এক বুক জলে দাঁড়িয়ে মাতৃনাম গান করছিলেন। সেই গান শুনে নবাব বিষাদের মধ্যে যেন একটা হরিষের সন্ধান পেলেন। আর এই হরিষের সন্ধান পেয়েই নবাব এই আত্মভোলা পাগল লোকটিকে পানসিতে তুলে নেবার জন্য মাল্লাকে আদেশ দিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ পানসিতে উঠেই নবাবজাদাকে দেখেই পার্শী ভাষাতে বিনীতস্বরে বললেন, আদেশ করুন নবাবজাদা এই দীন ভিখারী আপনার কি উপকারে লাগতে পারে?

রামপ্রসাদের বিনয় বাক্য শুনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা একটু ম্লান হাসি হেসে, তারপর একটা বিষাদময় দৃষ্টি তুলে আত্মভোলা সাধকের মুখের দিকে তাকিয়ে পার্শী ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করলেন, এই মাত্র যে গান শুনছিলাম তা কি তুমি করছিলে?

রামপ্রসাদ বিনয়ের স্বরে উত্তর দিলেন, হাঁ! জাঁহাপনা, মায়ের এই দীন সেবকই মাতৃনাম গান করছিল।

রামপ্রসাদের বিনয় উত্তর শুনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিনীত স্বরে তাঁকে অনুরোধ জানালেন, তাঁকে দুটো গান শোনাবার জন্য। আর তাঁর এই অনুরোধের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল একটা দীনতাব ভাব। নবাবের অশান্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তির বারি সিঞ্চন করবার জন্য একটা কাতর আহ্বান। আর সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারলেন না সাধক কবি রামপ্রসাদ।

তা ছাড়া উপেক্ষা করবেনই বা কি করে?

নবাবজাদার অন্তরের এই আকুল আহ্বান থেকেই যে এই মায়াময় সংসারের পার্থিব জীবজগতের মাধ্যমেই বিশ্বমাতার অর্থাৎ মহামায়ার এক করুন আহ্বান এসে দাঁড়িয়েছে তাঁরই সম্মুখে। শুধু আহ্বান নয়, অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করবার জন্য একটুখানি শান্তির বারির জন্য প্রার্থনা।

ভক্তের কাছে যেন ভগবানের আকুতি।

মায়ার কাছে মহামায়ার করুণ মিনতি!

এই আকুতি বা মিনতিতে ঔদাসিন্যের আবরণ টেনে এনে কি করে উপেক্ষা করবেন! তাইত রামপ্রসাদও উপেক্ষা করতে পারলেন না, নবাবজাদার এই করুণ মিনতিতে তাই তাঁকে গাইতে হলো মাতৃনাম গান।

রামপ্রসাদ প্রথমেই পার্শী ভাষাতে গাইলেন পর পর তু'খানি মায়ের নাম গান। কিন্তু এই পার্শী ভাষাতে মায়ের নাম গান শুনে সিরাজের মন ভরল না। তাই তিনি একটুখানি বিরক্তির স্বরে বললেন, না! ঠাকুর না! এই মাত্র তুমি যে ভাষায় গান করছিলে সেই ভাষাতেই আমায় গান শোনাও।

সিরাজের কথা শুনে রামপ্রসাদ সানন্দে বললেন, নবাবজাদার যা আদেশ! বলেই একটু আনন্দ প্রকাশ করলেন। কারণ, অন্য দেশীয় ভাষায় গান করতে গিয়ে রামপ্রসাদ যেন একটা ক্লেশ অনুভব করছিলেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথাতে মুহূর্তের মধ্যে সেই ক্লেশ ভাব তিরোহিত হয়ে গিয়ে, একটা আনন্দ ভাব অনুভব করতে লাগলেন। তিনি একবার নিজের মনেই জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্ম তুখানি স্মরণ করলেন। তারপর স্বকীয় মাতৃভাষায় এবং উদার উদাস ভাবে নিজস্ব সুরে গাইতে লাগলেন জগন্মাতার নাম গান—

"মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হয়ে ধর্ম-তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তবু শিবের দৈন্যদশা॥
সে যে তুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন, করো না এ কথায় গোসা॥" ইত্যাদি...

এমনি ধারা পর পর তু'তিন খানি মাতৃনাম গান গেয়ে গেলেন রামপ্রসাদ। শুধু মাতৃনাম গান করা নয়—হতভাগ্য ও ভাগ্য বিড়ম্বিত নবাব সিরাজউদ্দৌলার মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ শান্তি বারি প্রদান

করলেন। যেমন করে জ্বলন্ত পাবক শিখার মধ্যে জল নিক্ষেপ করে, পাবক শিখাকে নির্বাপিত করা হয়, তেমনি করে নবাবের অশান্ত মনাগ্নিতে নামগানামৃত বারি প্রদান করে তার তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করলেন।

রামপ্রসাদ যেন ঐশ্বর্যময়ীর বিশাল ঐশ্বর্য ভাণ্ডারকে লুণ্ঠন করে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন! তন্ময়ী হয়ে রইলেন মাতৃনাম-গানামৃততে।

আর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যাকাশের শেষ প্রদীপ, নবাব সিরাজউদ্দৌলাও যেন সেই নীরব স্তব্ধতার মধ্যে, সেই তন্ময়তার মধ্যে ডুবে গেলেন। অমৃতময় মাতৃনামগানামৃততে স্বীয় ভাগ্য বিড়ম্বনার কথাও পর্যন্ত ভুলে গেলেন। শুধু তাই নয়, নবাবজাদার পানসির মাঝি মাল্লারা পর্যন্ত সেই মাতৃনামগানামৃত সুধা পান করতে করতে পানসির দাঁড় টানার কথা ভুলে গেল!

এমনি এক নীরবতার ভিতর দিয়ে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ এক সময় সেই নীরবতাকে ভঙ্গ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলা একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে, শুদ্ধ পার্শী-ভাষাতেই বললেন, ঠাকুর সার্থক তোমার জীবন-মন। সার্থক তোমার খোদার কাছে আর্জি পেশ করা। তাই তুমি খোদার কাছ থেকে অশেষ করুণা লাভ করতে পেরেছ।

এই পর্যন্ত বলে নবাব একটুখানির জন্য নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবজাদা আজ দীন কাঙাল। তাই গুণীর মর্যাদা রাখবার জন্য আমি যে ইনাম দিয়ে থাকতাম তা আজ দেবার মতন এতটুকু সামর্থ নেই। শুধু খোদার কাছে আর্জি জানাই, খোদাই তোমার মঙ্গল করুন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা শুনে প্রশান্ত একটা হাসির রেখাতে রামপ্রসাদের সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। হাসিমুখেই বললেন, নবাবজাদার অশেষ মেহের বাণী। একটু খানি নীরব থেকে আবার বললেন, সেই ইনামের থেকে বর্তমানে যা দান করলেন তার

তুলনায় হীরা জহরৎ মণি মুক্তো অতি তুচ্ছ। কেননা, এই দীন সেবক একমাত্র খোদার মেহেরবাণীই প্রার্থনা করে।

—হ্যাঁ ঠাকুর! খোদা বান্দার কাছে তোমার জন্য এই প্রার্থনা করবো। এর থেকে বেশী কিছু জানিয়ে তোমায় অবমাননা করবো না। বললেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

হ্যাঁ নবাবজাদা। এর থেকে বেশী কিছু কামনা করে না এই দীন সেবক। বলেই রামপ্রসাদ নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্য নীরবে প্রার্থনা জানালেন জগন্মাতার কাছে। তারপর এক সময় নবাবজাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এলেন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বক্ষে নামানো স্নানের ঘাটে। ফিরে এসেই সদানন্দময় রামপ্রসাদ, সদা আত্মভোলা রামপ্রসাদ মাতৃনাম গানে ভাগীরথীর তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলতে লাগলেন।

সদানন্দময় আত্মভোলা রামপ্রসাদ আত্মসমাহিত হয়ে রইলেন মাতৃনাম গানে—

"কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের গান গাহিব॥"

সর্বাণী দেবী অস্থির হয়ে উঠেছেন।

সংসারের অভাব অনটনের ত অন্ত নেই। উপরন্তু ঘরের বেড়া পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এমন কি অনেক স্থান ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অথচ তার উপায় করবার জন্য কোন সংস্থানই নেই। তাই ত সর্বাণী দেবী এতই অস্থির হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু এই সব ক্ষুদ্র বিষয়গুলি সদা আত্মভোলা, মা অন্তপ্রাণ স্বীয় স্বামীকে জানাতে একটা সংকোচ অনুভব করছেন। যাঁর স্বামী জগন্মাতার আরাধনায় জগন্মাতার নামগানে আত্মহারা হয়ে রয়েছেন,

সেই দেবতুল্য স্বামীকে সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নামিয়ে এনে করবেনই বা কি করে?

না। তা কখনো সম্ভব হতে পারে না। স্বামীকে এই সব বিষয় কোন মতেই জানাবেন না। ভাবেন সর্বাণী দেবী।

সংসারের অভাব অনটন যত বড় করে আসুক না কেন, ঘরের বেড়া যতই ভেঙ্গে পড়ুক না কেন, তবু স্বীয় স্বামীর কাছে ব্যক্ত না করে একমাত্র বরাভয়দায়িনী অভয়ার কাছে প্রার্থনা জানান। এখন মা তোর যা ইচ্ছে তাই কর।

তাছাড়া তাঁর স্বামীই ত জগন্মাতার কাছে গেয়েছেন, "ইচ্ছাময়ী তারা মাগো, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

নিজের মনেই স্বীয় স্বামীর রচিত মাতৃনাম গানের কথাগুলি ভেবে নিয়ে মনকে দৃঢ় করবার চেষ্টা করেন সর্বাণী দেবী। মনকে দৃঢ় করতে গিয়ে নীরবেই অন্তর্যামিনী জগন্মাতার কাছে নীরব প্রার্থনা জানান, মাগো তোর একান্ত ভক্ত সন্তানকে সংসারের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে রেখেছিস তাতে আমার কোন দুঃখ নেই মা কিন্তু তোর এই আবোধ সন্তানদের তুই রক্ষা করিস মা। আর এই ভাঙ্গা আশ্রয়টুকুকে বিলুপ্ত করে দিস না।

সর্বাণী দেবীর এই নীরব প্রার্থনা জগন্মাতার প্রাণে বুঝি স্পর্শ করল। তাঁর অটল আসন বুঝি ক্ষণিকের জন্য নড়ে উঠল। তাই একদিন সংসার বিরাগী আপনার প্রিয় ভক্তকে আবার সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে আনলেন। যেন অঙ্গুলী তুলে দেখিয়ে দিতে চাইলেন, বুঝিয়ে দিতে চাইলেন তারই সুতোর টানে যে সংসার পেতেছিল আর যাদের জন্মদান করেছিল, তাদের বর্তমানের দুঃখ-দৈন্যতার রূপটি।

রামপ্রসাদ যেদিন তাঁর সাধন ক্ষেত্র থেকে নেমে এসে, সংসারের মধ্যে ফিরে এলেন, তার চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠল সংসারের দুঃখ-দৈন্যতার ছবিটি।

সেই দুঃখ-দৈন্যতার ছিন্নগুলি একের পর এক চোখের সামনে ফুটে উঠতেই রামপ্রসাদের সমস্ত অন্তরটা বেদনায় কেঁদে উঠল। আহা রে!

কে একটি বারের জন্যও তাকাবার সময় করে নিতে পারেন নি। কথাগুলি মনে মনে ভাবলেন রামপ্রসাদ। কিন্তু তাও নিমেষের জন্য।

তারপর আত্মভোলা সাধক রামপ্রসাদ আবার আত্মসমাহিত হয়ে যান। আর তারই সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের সমস্ত আর্তি জানান অভয়ার অভয় চরণ তলে।

"অভয় চরণ সব লুটালে।
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে॥"

জগন্মাতার কাছে অন্তরের আকুতি জানাতে গিয়ে, রামপ্রসাদের সমস্ত মনটা যেন বার বার লুটিয়ে পড়তে চায় অভয়ার অভয় চরণ তলে। কিন্তু তা নিমেষের জন্য। আবার তাঁর মন ঘুরে আসে সংসারের মায়ার গণ্ডীর মধ্যে। আর এই সংসারের মায়ার গণ্ডীর মধ্যে তাঁর মনকে ঘুরিয়ে আনলেই বা কি হবে। অভয়দায়িনী অভয়ার অভয় চরণ দু'খানি দেখে রামপ্রসাদ আত্মহারা হয়ে ওঠেন।

অভয়ার অভয় চরণ দু'খানি দেখে আকুল কণ্ঠে আত্মসমাহিত ভাবে বলে ওঠেন, মা! মাগো! ছিলাম গৃহবাসী, তুই করলি মা বনবাসী; তবে আবার কেন বনবাসী থেকে গৃহবাসী করবার জন্য এই মায়াময় সংসারের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়ে আনলি। কি তোর অভিপ্রায়? আর এই কি তোর লীলাখেলা মা! তুই যদি জানিয়ে না দিস্ তবে আমি জানব কি করে।

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে পতিপ্রাণা সর্বাণী দেবী ছুটে আসেন অভাবের সংসারের সকল কাজকর্ম পরিত্যাগ করে।

তাঁরই পাদবন্দনা করে তারই সেবা যত্নের দিকে মনোনিবেশ করলেন। নিজের মনেই ভাবলেন—মন মোহিনী মহামায়া তাঁরই আকুল কান্নায় পরিতুষ্ট হয়ে আবার তাঁর স্বামীকে সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং স্বামীর চরণ বন্দনা করবার সুযোগ দিয়েছেন।

তাই সর্বাণী দেবী মনে মনে জগন্মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম

জানিয়ে স্বামীর সেবা যত্নে জীবন সপে দিলেন। অথচ সংসারের শত সহস্র অভাব অনটনের কথা জানিয়ে কোন অভিযোগ করলেন না।

কথায় আছে, যাঁর সংসার সেই নেয় আপন ভার।

আপন সংসারের খুঁটি-নাটি সব কিছুই তাঁর নখদর্পনে। তাই সর্বাণী দেবী সংসারের অভাব অনটনের কথা স্বামীকে না জানালে কি হবে। সংসার পালয়ত্রী একদিন তাঁকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, তাঁরই রচিত সংসারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সদা আত্মভোলা ভক্ত সন্তানকে। আর অমনি ভক্ত সন্তানও দেখলেন সংসারের অভাব অনটন। আর দেখলেন শুধু অভাব অনটন নয়, ঘরের বেড়া পর্যন্ত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। বাইরের গরু বাছুরেরা এসে নানা উৎপাত জুড়ে দিয়েছে। ভাবলেন রামপ্রসাদ! আহাঃ, না জানি কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে এদের চলছে। এমন কি, এ ক'টা দিনের মধ্যে ঘরের সব বেড়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। অথচ এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই ভবের সংসারের দিকে তাকাবার অবসর পেলেন না।

কথাগুলি ভাবলেন রামপ্রসাদ নিজের মনেই।

তারপর স্ত্রী সর্বাণী দেবীকে ডেকে বললেন, দেখ ঘরের বেড়া ত সব ভেঙ্গে গেছে, অথচ তার জন্য আমাকে ত কিছুই বললে না?

সর্বাণী দেবী স্বামীর কথাতে বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, আপনি জগন্মাতার নামে আত্মহারা হয়ে রয়েছেন। তাই এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করিনি।

সর্বাণী দেবীর উত্তর শুনে রামপ্রসাদ আর দ্বিতীয় কোন কথা না বলে একটা কাটারি আর অল্প দড়ি এনে দেবার জন্য বললেন।

পতিপ্রাণা সর্বাণী দেবী স্বামীর আদেশে একটা কাটারি ও অল্প দড়ি গৃহাভ্যন্তর থেকে এনে স্বামীর কাছে রাখলেন।

সর্বাণী দেবী কাটারি আর দড়ি রামপ্রসাদের কাছে এনে দিতেই তিনি পুনশ্চ বললেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরীকে ডেকে দিতে। রামপ্রসাদের এই কথাতে সর্বাণী দেবী সম্মতি জানিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করলেন। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে পাঠিয়ে

দিলেন। পরমেশ্বরী তার পিতার কাছে এসে দাঁড়াল এবং ধীর কণ্ঠে বললে, বাবা তুমি আমায় ডাকছিলে ?

—হাঁ মা। ঘরের বেড়াটা ভেঙ্গে গেছে, আয় মা একটু বেঁধে দিই। তুই দড়িটা একটু ফিরিয়ে দে মা। বললেন রামপ্রসাদ।

পরমেশ্বরী পিতা রামপ্রসাদের কথাতে, 'আচ্ছা' বলে পিতাকে সাহায্য করবার জন্য বসে গেল।

আর রামপ্রসাদ ?

রামপ্রসাদ ভাঙ্গা ঘরের বেড়া বাঁধতে বসে গেলেন এবং আপন মনেই মায়ের নাম গান কবতে লাগলেন।—

"মুক্ত কর মা মুক্ত কেশী।
ভবে যন্ত্রনা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কতদিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধ'রে পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥

আত্মভোলা রামপ্রসাদ আপন মনে মায়ের নাম গান করতে করতে ঘরের বেড়া বেঁধে চলেছেন—আর তাঁরই জ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরী পিতার এই বেড়া বাঁধার কাজে সাহায্য করে চলেছে।

প্রসাদ আপন মনে মায়ের নাম গান করতে করতে আপন খেয়ালের বশে বেড়া বাঁধার দড়িটা বাড়িয়ে দেন আর অপর পার্শ্ব থেকে কন্যা পরমেশ্বরী বাড়িয়ে দেয় দড়িটা পিতার দিকে। এমনি এক আত্মগত ভাবে রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বেঁধে চলেছেন। কোন দিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই। শুধু আত্মগত ভাবে মাতৃনাম গানে বিভোর হয়ে ঘরের বেড়া বাঁধার কাজে মগ্ন হয়ে রইলেন।

এমন সময় সর্বাণী দেবী সংসারের কি একটা কাজের জন্য জ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরীকে ডাকতেই পরমেশ্বরী তার পিতাকে দড়ি ফিরিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়ে মায়ের আহ্বানে চলে যায়। অথচ রামপ্রসাদ

তার এতটুকুও জানতে পারলেন না। শুধু নিজের খেয়ালে মায়ের নাম করতে করতে বেড়া বেঁধে চলেছেন।

রামপ্রসাদ মায়ের নাম গান কবতে করতে দড়িটা বাড়িয়ে দেন, আর তার ঠিক পর মুহূর্তেই অপর দিক থেকে দড়িটা আবার তাঁর হাতের কাছে চলে আসে।

রামপ্রসাদ জানতেন যে, তাঁরই জ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরীই তাঁর ঘরের বেড়া বাঁধার কাজে সাহায্য করে চলেছে। এমনি আত্মগত ভাবে ঘরের বেড়া বাঁধতে বাঁধতে এক সময় বেড়া বাঁধার কাজ সম্পূর্ণ করে উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় পরমেশ্বরী গৃহাভ্যন্তর থেকে ফিরে এসেই সবিস্ময়ে বলে উঠল, বাবা তোমার ঘরের বেড়া বাঁধা শেষ হয়ে গেল ?

রামপ্রসাদ প্রশান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ মা! এই ত শেষ করে উঠলাম। পরমেশ্বরী বললে, সে কি বাবা! তোমায় দড়ি ফিরিয়ে দিল কে ?

—কেন মা ? তুমিই ত ফিরিয়ে দিচ্ছিলে।

—বা রে! আমি আবার কখন ফিরিয়ে দিলাম ? মা আমায় ডাকতে আমি মায়ের কাছে গিয়েছিলাম যে। আমি আর তোমায় দড়ি ফিরিয়ে দিইনি ত বাবা। পরমেশ্বরী সবিস্ময়ে উত্তর দিলে।

রামপ্রসাদ তার কথা শুনে ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, তুই এখানে ছিলিনা মা ? তুই দড়ি ফিরিয়ে দিস্‌নি মা ? তা হলে কে দড়ি ফিরিয়ে দিল! তবে ওই পাষাণের বেটিই কি ঘর বাঁধার দড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে!

তা হলে কি আমার তনয়ারূপে এসে আমার ভাঙা ঘরের বেড়া বেঁধে গেল ?

আত্মহারা হয়ে উঠেন রামপ্রসাদ। ভুলে গেলেন আপন সত্বা পর্যন্ত! ভুলে গেলেন আপন কন্যা পরমেশ্বরীর কথা। ভুলে গেলেন আপন কন্যা বিস্ময় ভরা চোখ দু'টি তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু একটা অজানিত উন্মাদনায় ভরে উঠেছে মন। একটা

অজানিত আকাঙ্খায় তাঁর মন বার বার কেঁদে ওঠে। পাষাণের বেটির চরণ পাবার আশায়। সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ এই ত্রয়ীগুণ সমন্বিত মহাশক্তির চরণ পাবার আশায়। আদি অনাদি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের পূজিতা জগন্মোহিনী জগজ্জননী আজ তাঁরই কন্যারূপে এসে, তাঁরই ভাঙ্গা ঘরের বেড়া বেঁধে গেলেন। অথচ এক পলকের জন্য নয়ন তুলে দর্শন করবার সুযোগ পেলেন না। তাই তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মাটা একটা আকুল ক্রন্দনে ভরে ওঠে। সেই আকুল ক্রন্দনে তাঁর সমস্ত দেহটা যেন বার বার কম্পিত হয়ে ওঠে। তাই তিনি ক্রন্দনাবেগে গেয়ে উঠলেন—

"মন কেন মায়ের চরণছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তিদড়া॥
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া-রূপেতে, বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবরছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্টকড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে মা তোমায় তাড়া।
তখন একবার এসে কন্যারূপে রামপ্রসাদের বেঁধো বেড়া॥"

রামপ্রসাদের অন্তরাত্মা যেন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। আকুলি-বিকুলি করে ওঠে এই যে, যাঁর ইঙ্গিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, যিনি জগন্মাতারূপে সকলেরই হৃদয়াসনে উপবেশন করে রয়েছেন, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পালন করে চলেছেন সেই জগৎ জননী মহামায়া মহাশক্তি নাকি আজ তাঁরই তনয়ারূপেতে তাঁরই ঘরে বেড়া বেঁধে গেলেন। অথচ এক মুহূর্তের জন্য তিনি দেখলেন না স্বীয় কন্যা ভ্রমে।

না। হৃদি পদ্মাসনে স্থান করে দিতে পারলেন না। এর থেকে আর কি আফশোষ হতে পারে! এর থেকে নিষ্ঠুর বেদনা আর কি হতে পারে। তাই ত আকুল হয়ে তাঁকে কাঁদতে হচ্ছে।

অন্তর্যামিনী জগন্মাতা বুঝি এমনি করে ভক্তকে কাঁদাতে ভালবাসেন। এমনি করেই বুঝি বা ছলনা করে বেড়ান। তাই ত রামপ্রসাদ হতাশায় আকুল হয়ে গাইতে থাকেন—

"নয়ন থাকতে দেখলেনা মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
ভক্তে যে ছলিতে তনয়া রূপেতে,
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।"

॥ ৯ ॥

"ওমা কোন দোষে দোষী হলাম
মাগো, তোর চরণ তলে!
তাইত কাঁদাস মাগো,—
তাই, কাঁদি আমি বারে বারে।"

এই ঘটনার পর থেকেই রামপ্রসাদের মন যেন আরো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাঁর সমস্ত অন্তরটাই যেন গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে! শুধু তাই নয় একটা কিসের টানে আর কোন এক মহাশক্তির আকর্ষণে তাঁর মন আকুলি বিকুলি করে ওঠে। আর তারই সাথে রামপ্রসাদ অনুভব করতে থাকেন, একটা অসহ্য যাতনা। সেই সঙ্গে তাঁর মনও যেন দীন-হীন কাঙালের মত জগন্মাতার চরণ পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু কৃপাময়ী জগন্মাতা, কৃপাহীনের মতই একবার ধরা দিতে দিতে আবার কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েন। যেন মা-অন্তপ্রাণ সন্তানের

রামপ্রসাদ। মাকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারেন না। তাই আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন, কখনো বা অভিমান করেন। আবার কখনো কখনো জগন্মাতাকে গালি দিয়ে বলেন, তুই পাষাণের মেয়ে, তুই পাষাণ হয়ে থাক্। তোকে আর মা বলে ডাকব না! ডাকব না।

আর এমনি গালি না দিয়েই বা কি করেন! পাষাণ পিতার পাষাণ মেয়ে হয়ে চক্ষু-কর্ণের মাথা খেয়ে বসে রয়েছেন। এই বিশ্বসংসারকে, এই বিশ্বসংসারের প্রতিটি প্রাণীর পালন করবার নাম করেই যেন জ্বালা-দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়ে কাঁদিয়ে মারছেন। আর যাদের মা অন্তপ্রাণ তাদেরকে যেন আরো বেশী জ্বালা-দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়ে কাঁদিয়ে মারেন। রামপ্রসাদকেও এমনি করে জ্বালা-দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়ে কাঁদাচ্ছেন। খেলাচ্ছলে কাঁদাচ্ছেন! কোলের কাছে টেনে নিয়ে আবার দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। তাই ত রামপ্রসাদের দুঃখের অন্ত নেই।

এমন কি ক্ষোভেরও অন্ত নেই। তাই ক্ষোভ আর অভিমান ভরে রামপ্রসাদ গাইতে থাকেন—

"আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকবো না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে॥"

অন্তরের মধ্যে একমাত্র মাতৃনাম, মাতৃনাম গানই সার হয়ে ওঠে রামপ্রসাদের। শুধু মাতৃনাম গান দিনের পর দিন প্রজ্বলিত পাবাক শিখার মতন ভাস্বর হয়ে ওঠে।

কেন না যে জগন্মাতা ভক্তি প্রেমে বন্দী হয়ে ভক্তেরই তনয়ারূপে এসে ঘরের বেড়া বেঁধেছেন; সেই অভয় বরদায়িনী অভয়াকে কেমন করে ভুলবেন?

এ যে ভোলার বাইরে। এ যে ভোলা যায় না। মায়ের গর্ভজাত

জগন্মাতার কথা ভুলতে পারেন না।

তা'ছাড়া জগন্মাতা পাষাণ মেয়ে হয়েও. ভক্তের আকুল ক্রন্দনে পাষাণ হয়ে থাকতে পারেন না, তাই পাষাণের মধ্যেই জাগ্রত হয়ে ওঠেন। যেন মৃন্ময়ী পীঠে চিন্ময়ী রূপে প্রকাশিত হয়ে ভক্তের আকুল ক্রন্দনে সাড়া দেন; তার মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্য প্রয়াসী হন। নানারূপে নানারঙ্গে আর নানা লীলাখেলার ভিতর দিয়ে মা-অন্ত প্রাণ সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেন।

আবার কখনো বা ভক্ত সন্তানকে নানা রকম ছলনা করে চলেন। পরখ করে দেখেন মায়ের জন্য সন্তানের টান কেমন তরো, আর কেমন তরো তার কান্না তাই।

'তনয়া রূপেতে' জগন্মাতা রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া বেঁধে যাবার পর থেকেই রামপ্রসাদের সমস্ত মন-প্রাণ শতগুণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে অভয়ার অভয় চরণ দু'খানি পাবার আশায়। তাই ত তাঁর মন বার বার কেঁদে কেঁদে ফিরতে থাকে শুধু মাতৃনাম গানের মধ্যে। যেন আকুল কান্নার ভিতর দিয়ে মা'য়ের আসনকেও পর্যন্ত প্রকম্পিত করে তুলবার জন্য যেন পাগল হয়ে উঠলেন।

"তোমার কে মা বুঝবে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে॥
তুমি দিয়ে নিচ্ছ তুমি, বাছ রাখ না সাঁঝ সকালে।
তোমার অসীম কার্য অনিবার্য মাপাও যেমন যার কপালে॥"

অন্তরের আকুলতা ভরা ক্রন্দনের মধ্যে কখনো বা আবেগে আবার কখনো বা পরিপূর্ণ হতাশায় মনকে পরিপূর্ণ করে তোলে রামপ্রসাদের। তাই এমনি আবেগে আর আকুল ক্রন্দনের মধ্যে মা'য়ের আসনকে টলাবার চেষ্টা করেন। এমনি আবেগ আর হতাশায় ভরা মন নিয়ে আরো কিছুদিন সংসারের গণ্ডীর মধ্যে থেকে নিত্য ভাগীরথীতে অবগাহন করা, আর মায়ের নাম গান করাই এক-

ফিরে এসেও পূর্বেকার মতন নির্লিপ্ত আর নির্বিকার হয়ে রইলেন। এমনি করে দিনের পর দিন যায়।

একদিন রামপ্রসাদ সকালে তৈলমর্দ্দন করে, গঙ্গায় অবগাহন করবার জন্য যাবেন; ঠিক তেমনি সময় একজন বিধবা বৃদ্ধা এসে রামপ্রসাদের সামনে দাঁড়ালেন। রামপ্রসাদের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা! এটা কি রামপ্রসাদের বাড়ী।

রামপ্রসাদ বিনীত স্বরে বললেন, হাঁ মা এটাই রামপ্রসাদের বাড়ী। কিন্তু, তুমি কোথা থেকে আসছ মা?

বৃদ্ধা তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে পুনশ্চঃ বললেন, সে কি বাড়ী আছে বাবা? আমি অনেক দূর থেকে তার গান শুনবার জন্য এসেছি।

—হাঁ মা! আমারই নাম রামপ্রসাদ। তুমি মায়ের নাম গান শোনবার জন্য এসেছ; তা' তোমায় নিশ্চয় শোনাব বৈকি! তবে মা তোমায় একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে। বললেন রামপ্রসাদ। গায়ে তেল মেখে ফেলেছি, গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে এসেই তোমায় মায়ের নাম গান শুনিয়ে দেব মা।

বৃদ্ধা বললেন, সে কি বাবা! অনেক দূর থেকে তোমার গান শুনতে এলাম, তাছাড়া তোমার গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসতে আসতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। তার থেকে......বাধা দিয়ে, রামপ্রসাদ বললেন, না না মা। আমার বিশেষ দেরী হবে না। তুমি একটুখানি অপেক্ষা কর মা! আমি যাবো আর ডুব দিয়েই এক্ষুনি চলে আসব।

রামপ্রসাদের কথা শুনে, অগত্যা বৃদ্ধা বিরস বদনে বললেন, তুমি যখন আগেই গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসতে যাবে বাপু—তা' যাও। কিন্তু বেশী দেরী করো না। আমার সংসার ত নেহাত একটুখানি নয়। বেশী দেরী করলে সবাই আমার জন্য অস্থির হয়ে উঠবে।

—না না মা! বেশী দেরী করবো না। বললেন রামপ্রসাদ। তুমি

ঘরের দাওয়ায় উঠে বসে একটু অপেক্ষা কর মা। আমি যাব আর আসব।

অগত্যা বৃদ্ধা আর কি করেন? অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, বেশ। যাও বাবা, যত তাড়াতাড়ি পার ডুব দিয়ে এসো, ততক্ষণ তোমার ঘরের দাওয়ায় বসে আমি অপেক্ষা করছি।

রামপ্রসাদ সানন্দে মায়ের নাম স্মরণ করতে করতে চললেন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দিকে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ডুব দিয়ে এসে কোন অজানা গাঁয়ের থেকে আসা বৃদ্ধাকে মাতৃনাম গান গেয়ে শোনাবার একটা অদমা বাসনা নিয়ে।

ছুটে চলেছেন রামপ্রসাদ। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতে 'ডুব দেরে মন কালী বলে' বলেই ডুব দিয়ে সত্বর ফিরে আসবার জন্য। এমনি ছুটে এসে দাঁড়ালেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বক্ষের উপর নামানো বাঁধানো সোপান শ্রেণীর উপর। আর কাল বিলম্ব না করে তর্ তর্ করে নেমে গেলেন রামপ্রসাদ ভাগীরথীর গর্ভে। এবং ভাগীরথীব গর্ভে নেমেই 'তারা তারা' বলে ডুব দিয়ে উঠে এলেন। উঠে এসেই আবার ছুটে চললেন আপনার গৃহাভিমুখে। কারণ সেই অচিন গাঁয়ের বৃদ্ধাকে তিনি কথা দিয়েছেন, ভাগীরথীতে ডুব দিয়ে এসেই তাঁকে মাতৃনাম গান শোনাবেন বলে!

সত্যনিষ্ঠ রামপ্রসাদ তাঁর কথা রাখবার জন্য ভাগীরথীর সুশীতল বারি ধারায় সত্বর ডুব দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে স্বীয় বাড়ীতে ফিরে এলেন। এবং ফিরে এসেই দেখলেন, এই কিছুক্ষণ পূর্বে ভিন্ গাঁয়ের যে বৃদ্ধাকে ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে রেখে স্নানের জন্য ভাগীরথীতে গিয়েছিলেন, সেই বৃদ্ধা তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে নেই। তিনি আর অপেক্ষা না করে কোথায় চলে গেছেন।

তাঁকে দেখতে না পেয়ে রামপ্রসাদের সমস্ত অন্তরটা বার বার গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠতে লাগল। তাই রামপ্রসাদ নিজের মনে ভাবলেন,—আহা! কতদূর, কোন এক অচিন গাঁয়ের থেকে কষ্ট করে হেঁটে এসেছিলেন তাঁরই কণ্ঠে মাতৃনাম গান শোনবার

জন্য। আর রামপ্রসাদ কিনা তাঁকে মাতৃনাম গান শোনাতে পারলেন না।

অন্তরটা বার বার গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে ওঠে সত্যনিষ্ঠ রামপ্রসাদের। তাই তিনি মনকে শান্ত করবার জন্য সেই আচন গাঁয়ের বৃদ্ধার অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তাঁরই বাড়ীর আশে-পাশে চারিদিকে। যদি আশে-পাশে কোথাও গিয়ে থাকেন এই আশায়। কিন্তু হায়, কোথায় সেই অচিন গাঁয়ের বৃদ্ধা!

আশে-পাশে চারিদিকে অনুসন্ধান করেও, তাঁর কোন সন্ধান পেলেন না। যেন কোন এক যাদু বলে কোথায় উবে গেছেন। তাই হতাশ হয়ে ফিরে এলেন তাঁর ঘরের দাওয়ায়। ফিরে এসে ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, তাঁরই ভাঙ্গা ঘরের দেওয়ালে স্পষ্ট অক্ষরে কি যেন লেখা রয়েছে। তাই রামপ্রসাদ স্পষ্টাক্ষরগুলি দেখে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে পড়তে লাগলেন। লেখা রয়েছে—

> "আমি কাশীর অন্নপূর্ণা। তোর গান শুনতে এসেছিলাম! আর বেশী দেরী করতে পারলাম না। কাশীতে গিয়ে আমায় গান শুনিয়ে আসিস!"

কথাগুলি পাঠ করেই রামপ্রসাদ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। মা! মাগো, তোর একি ছলনা! একি ছলনা করলি মা! তোর চরণ তলে কি অপরাধ করেছি মা! দেখা দিলি ত ধরা দিলি না কেন মা!

আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন রামপ্রসাদ। বিগলিত ধারায় তাঁর সমস্ত বুক ভেসে যেতে লাগল। আর তাঁর কণ্ঠ থেকে শুধু একটি কথাই বার বার নিঃসারিত হতে লাগল—"দেখা দিলি ত মা, ধরা দিলি না কেন?"

রামপ্রসাদের আর্তনাদে পতিপ্রাণা সর্বাণী দেবী গৃহকর্ম পরিত্যাগ করে ছুটে আসেন। এবং ছুটে এসেই তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। অথচ তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না, হঠাৎ কি এমন ঘটনার জন্য

তাঁর স্বামীর এই পরিবর্তন ঘটে গেল! মাতৃগত প্রাণ স্বা
কি মাতৃদর্শন হলো? তাঁর জন্য এমন আকুল হয়ে কাঁদছেন? ভাবলেন সর্বাণী দেবী। অথচ, একটা সংশয়, একটা অজানিত দ্বিধা নিয়ে কেমন এক আকুলতাপূর্ণ মন নিয়ে সর্বাণী দেবী তাকিয়ে থাকেন স্বীয় স্বামীর মুখের দিকে। আর ভাবতে থাকেন—

তবে কি, তবে কি সেই পাষাণের বেটী তাঁর আত্মভোলা স্বামীর সঙ্গে আবার ছলনা করে গেছেন! —নিশ্চয়ই তাই!

তা না হলে তাঁর স্বামী এমন করে কান্না জুড়ে দিতেন না! ভাবতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে ঘরের দেওয়ালে লেখা স্বয়ং অন্নপূর্ণার লেখাটির দিকে। লেখাটি তাঁর নজরে পড়তেই তিনি উচ্চস্বরে তা পড়তে লাগলেন।

সর্বাণী দেবীর কণ্ঠস্বরে রামপ্রসাদের যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। তিনি একটা অতি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে সর্বাণী দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—আজই আমাকে কাশী যেতে হবে।

সাশ্চর্যে সর্বাণী দেবী বললেন, কাশী! কিন্তু কেন?

কেন? তা ঐ দেওয়ালের লেখাটি পড়েই কি বুঝতে পার না? কাশীর অন্নপূর্ণা মা'ই আজ বৃদ্ধারূপে এসে মাতৃনাম গান শুনতে চেয়েছিলেন! কিন্তু তেল মেখে স্নানের জন্য যাচ্ছিলাম, তাই তাঁকে দাওয়ায় বসিয়ে, ভাগীরথীতে স্নানে চলে যাওয়ায় আর তাঁকে গান শোনাতে পারলাম না। এক নিঃশ্বাসে বলে রামপ্রসাদ! আর একটু-খানি নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন, ভাগীরথীতে স্নান সেরে ফিরে এসে দেখি বৃদ্ধারূপী মা অন্নপূর্ণা নেই। তার পরিবর্তে শুধু ঘরের দেওয়ালে তাঁর এই আদেশই লেখা রয়েছে,—আমায় কাশীতে গিয়ে গান শুনিয়ে আসবি।

তাই আজই কাশীর দিকে যাত্রা করবো মা অন্নপূর্ণাকে গান শুনিয়ে আসবার জন্য, বললেন রামপ্রসাদ।

সবিস্ময়ে সর্বাণী দেবী বললেন, তা আজই যাত্রা করবেন? কিন্তু—

সর্বাণী দেবীকে বাধা দিয়ে রামপ্রসাদ বললেন,—না না এতে আর

কোন কিন্তু নেই। আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি আজই, আজ রাত্রেই আমি কাশীর দিকে যাত্রা করবো। মা-ই একমাত্র আমার সহায় হবেন। অতএব এর জন্য তোমার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

রামপ্রসাদের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনে সর্বাণী দেবী আর দ্বিতীয় কোন কথাটি বলতে পারেন না। তা'ছাড়া বলবেনই বা কি? যাঁর একমাত্র সহায় জগন্মাতা, তাঁর জন্য চিন্তা করবার কোন কারণই নেই। অথচ মন যেন বার বার চিন্তিত হয়ে ওঠে সর্বাণী দেবীর। ভাবেন, কি হবে তাঁর জন্য চিন্তা করে? উপরন্তু তিনি যাঁর আদেশে আজ কাশী যাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, সেই জগন্মাতাই আজ অন্নপূর্ণা রূপে আহ্বান জানিয়েছেন। আদেশ করেছেন, তাঁরই বন্দনা গান তাঁকে শোনাবার জন্য। 'অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণেহ' আহ্বানে বাধা প্রদান করা যে মহা পাপ।

নীরবে কথাগুলি নিজের মনে ভেবে নিলেন সর্বাণী দেবী। তার-পর ধীর অথচ প্রশান্ত স্বরে বললেন, তা'হলে আজ সন্ধ্যায়ই যাত্রা করবেন?

হাঁ! আজই, আজই সন্ধ্যায় যাত্রা করবো। উদাস স্বরে বললেন রামপ্রসাদ বলেই তিনি আপন খেয়ালে মাতৃনাম গান গেয়ে উঠলেন:-

> "মা তোমারে বারে বারে জানাব আর দুঃখ কত।
> ভাসিতেছি দুঃখ-নীরে, স্রোতের শেহালার মত॥
> আমার যে মা মূল বাঁধা নাই, কোথায় যেতে কোথা দাঁড়াই,
> ছয় দিকেতে ছয় রিপুর টান, মাঝে প'ড়ে হ'লাম হত।"

মাতৃনাম গানের মধ্যে নিজেকে আত্ম সমাহিত করে দেন রাম-প্রসাদ। যেন নির্বিকার আর আত্মসমাহিত ভাবে থাকেন। আর সর্বাণী দেবী?

সর্বাণী দেবী, তাঁর আত্মভোলা স্বামীর এই আত্মসমাহিত ভাব লক্ষ্য করে বেশ বুঝতে পারলেন যে,—তাঁর স্বামী মনের মধ্যে যে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তার থেকে তাঁকে এতটুকু বিচ্যুরিত করা যাবে

না। তাঁর এই দৃঢ় সংকল্পতে বাধা প্রদান করা বৃথা। তাছ জগন্মাতা যা করেন, যা' করাবেন তাই হবে! ভাবলেন সর্বাণী দেবী।

।। দশ ।।

"অন্ন পূর্ণে সদা পূর্ণে, শঙ্করী প্রাণ বল্লভে"।

সেই সকাল থেকেই রামপ্রসাদ 'অন্ন পূর্ণার' ভাবেই বিভোর হয়ে রইলেন। জগন্মাতা. জগতের অন্ন প্রদায়িনী কাশীর অন্নপূর্ণা বৃদ্ধা রূপে আজ তাঁবই কণ্ঠে মাতৃনাম গান শুনতে এসে বিফল মনোরথে ফিরে গেছেন।

ছলনাময়ী জগন্মাতা এমনি করে সন্তানের সঙ্গে ছলনা করে পালিয়ে গেছেন। ধরা দিয়েও ধরা দিলেন না। ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে আবার ক্ষণিকেব মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন। এবঞ্চ আদেশ করে গেলেন কাশীতে গিয়ে মাতৃনাম গান শুনিয়ে আসবার জন্য।

কঠিন কঠোর আদেশ জগন্মাতার। এই আদেশকে কখনো অবহেলা করা যায় না। অন্যথা করাও অতীব কঠিন। তাছাড়া করবেনই বা কি করে?

রামপ্রসাদ মনঃস্থির করে নিয়েছেন, দিনমান সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে পাটে নামবেন, যখন ধরিত্রীর বুকের উপর গোধূলির ছায়া নেমে আসবে, জেগে উঠবে আগত সন্ধ্যার শ্যাম গীত—সেই শুভ মুহূর্ত্তক্ষণে যাত্রা করবেন পুণ্য তীর্থ কাশীধামের দিকে।

অন্নপূর্ণার থান এই কাশী! আর এই কাশীর অন্নপূর্ণাই স্বয়ং আদেশ করে গেছেন! অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণাকে তাঁরই কণ্ঠে মাতৃনাম গান শুনিয়ে আসবার জন্য।

নানা চিন্তার ভিতর দিয়ে রামপ্রসাদের সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। নেমে আসে পৃথিবীর বুকের উপর অপরাহ্নের রঙ ফেরানোর পালা। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় নানা রঙের খেলা। তারপর এই রঙ ফেরানোর পালা-খেলা ধীরে ধীরে এক সময়

শেষ হয়ে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকারের একটা কালো যবানকা ধারে আত ধীরে সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস করে ফেলে। আর এই কালো যবনিকা সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস কবার সঙ্গে সঙ্গেই—পৃথিবীর এক নিভৃত নিকেতন, এই হালিশহর গাঁয়ের প্রতিটি ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে সান্ধ্যদীপ। কোন মন্দিরে কিংবা কোন এক নিভৃত গৃহ-দেবতার সান্ধ্যারতির এক সুমধুর ও বৈচিত্রময় ঐকতানে মুখরিত হয়ে ওঠে সমস্ত হালিশহর গাঁটি। সেই বৈচিত্রময়, সুমধুর ঐকতান আর অন্য কিছুরই নয়, শঙ্খ-ঘণ্টা আর কাঁসরের। অথচ সেই শঙ্খ-ঘণ্টা আর কাঁসরের, সেই বৈচিত্রময় সুমধুর ধ্বনি যেন,—সঙ্গীতের সুর ধ্বনি—সুরের লহরীর পর লহরীময়, একটা লীলায়িত ছন্দরূপে হালিশহর গাঁটিকে প্রকম্পিত করে তোলে। শুধু তা নয়—

অপূর্ব সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনি।—অপূর্ব সেই শঙ্খ ঘণ্টা আর কাঁসরের বৈচিত্রময় ঐকতান। কেন না এই এয়ী ধ্বনি যন্ত্র একই সুরে, একই তালে যে সুর ধ্বনি সৃষ্টি করে চলে, সেই সুরধ্বনিকে কোন সঙ্গীত সাধক শিল্পীর শিল্পযন্ত্রের সহিত তুলনা কবা চলে না। কেন না —এই ধ্বনি তুলনা হীন, বর্ণনা বিহীন!

এই সুর-ধ্বনি সামান্য মনুষ্য সমাজের প্রতিটি মানুষকে মোহাবিষ্ট করে তোলে, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে ভক্তি প্রেমের সঞ্চার করে; দুঃখীর দুঃখকে দূরীভূত করে। শোকার্তকে শান্তি প্রদান করে। সংসারের মায়া মোহ থেকে মুক্ত করে অমৃতঃস্য পুত্রাঃকে অমৃত পাবার সন্ধান জানিয়ে দেয়। কিন্তু রামপ্রসাদের অন্তরের মধ্যে সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি ধ্বনি যেন ঝঙ্কারিত হয়ে ওঠে। সেই ধ্বনি অন্তরবাসিনী শ্যামা মায়ের আহ্বান ধ্বনি।—

ওরে আয় আয়। তোর কণ্ঠে তোরই আপন সুরে আমায় গান শোনাবি আয়।

যেই মুহূর্তে তাঁর অন্তর বাসিনী শ্যামা মা অন্তরের গভীর থেকে এমনি আহ্বান জানালেন ঠিক সেই শুভ মুহূর্তেই রামপ্রসাদ যাত্রা

মায়ের নাম সম্বল করে, আর অন্তরে জগন্মাতা অন্নপূর্ণার মূত্তিরই ধ্যান করতে করতে পথ চলেছেন, পূর্ণতীর্থ বারাণসীর দিকে।

রামপ্রসাদ পথ চলতে চলতে গাইলেন :—

"দীন-দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছে, তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো, কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে মা, নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ, শুনিয়া না শুন, পিতৃ-ধর্ম রাখলে ভবে।
আমি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে, শরণ নিবার কাজ কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা! মোর ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম, অন্নপূর্ণা নাম,
জগজ্জনে আর নাহি লবে॥"

আমরা যে সময়ের কথা বলতে বসেছি, তা' আজ থেকে বহু—বহু বছর আগেকার কথা। সেই সময়ে আমাদের এই সুজলা-সুফলা বঙ্গদেশে, এখনকার মত যানবাহনের বিশেষ সুবিধা ছিলনা। তাই, তখনকার দিনে, আমাদের এই বাংলা দেশ থেকে অন্য কোন দেশে কিংবা তীর্থ স্থানে যেতে হলে অধিকাংশ সময়ে পদব্রজে যেতে হতো। অথবা পাল্কী বা গো-যানের সাহায্য গ্রহণ করতে হতো।

+ সাধক কবি রাম প্রসাদের সমসাময়িক আর একজন কবি শ্রীরাম প্রসাদ, নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তিনি অধিকাংশই যাত্রা গান রচনা করতেন, এবং নিজে গাইতেন। সেই সময়ে তাঁর এই সব গানের 'সুর-তাল-লয়' প্রায় সাধক কবির গানের সমতুল্য। তাই তাঁর এইসব গান, সাধক কবি রামপ্রসাদের মাতৃনাম গানের সহিত অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। সাধক কবির মাতৃনাম গান থেকে শ্রীরাম প্রসাদের গানগুলি পৃথক করা একটা দুরারোহ ব্যাপার।

প্রচলন ছিলনা। তা'ছাড়া বর্তমানে যেমন বিজ্ঞানের নব নব শক্তি উদ্ভাবন করে, অতি দুর্গমকে সুগম করে নেবার পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং অতীব দূরকে নিকটতম করা সম্ভব হয়েছে; তখনকার দিনে কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এই নব উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের শক্তির প্রভাবের কথা চিন্তা করা, ধ্যান-জ্ঞানেব কথা কল্পনা করা অষ্টাদশ শতকের জনসাধারণেব কাছে সুদূর পরাহত ছিল।

তা' ছাড়া এইসব দুর্গম পথ অতিক্রম করে পুণ্য তীর্থক্ষেত্রগুলি দর্শন করতে যেতে হলে, কোন তীর্থযাত্রী বা বিদেশযাত্রী এককভাবে যেতে সাহসী হতেন না। কাবণ পথ যতই দুর্গম হউক না কেন, তার থেকে শত গুণ বিপদও ছিল বর্তমান।

এই বিপদের ভয় অন্য কোন বন্য প্রাণীদের নয়—ডাকাত দস্যু এবং ঠেঙ্গাড়ের ভয়।

এই সব ডাকাত দস্যু আর ঠেঙ্গাড়েদের হাতে তখনকার দিনে কত নিরীহ পথিক কিংবা তীর্থ যাত্রীদের যে প্রাণ হারাতে হয়েছে, তার হিসেব করতে গেলে, কিংবা লিপিবদ্ধ করে রাখতে গেলে, একটা বিরাট দ্বিতীয় মহাভারতের সৃষ্টি হতো।

তবে এ কথা ধ্রুব সত্য যে, পথ যতই বিপদ সঙ্কুল হউক না কেন, সে যুগের ধর্মপ্রাণ মানুষ, অজানিত একটা ভক্তির টানে শত বিপদ মাথায় নিয়ে, এই সব বিপদ সঙ্কুল পথে যাত্রা করতেন। অবশ্য তাঁরা যখন এই বিপদসঙ্কুল পথে তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যে যেতেন তখন তাঁরা সংঘবদ্ধ ভাবেই যেতেন। তা' ছাড়া এই সব তীর্থ যাত্রীদের মনের মাঝে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, যখন এই পৃথিবীর মাঝে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, তখন 'মৃত্যু' একদিন না একদিন আসবে এবং এই মৃত্যুর হাত থেকে কেউ কোন দিন রেহাই পাবে না। তা' ছাড়া তাঁরা আরো ভাবতেন, মৃত্যু যখন অনিবার্য আসবেই তার জন্য অযথা চিন্তা করে লাভ কি?

তা ছাড়া মৃত্যুকে ভয় করে, পুণ্য সঞ্চয় করার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করারই বা ফল কি?

আর মৃত্যু যদিও বা আসে, তা' স্বাভাবিক ভাবে আসুক কিংবা অস্বাভাবিক ভাবেই আসুক অথবা অপঘাতেই হোক না কেন তা'কে প্রতিরোধ করা সামান্য মানুষের সাধ্যাতীত।—সুতরাং তার কথা ভাবতে গিয়ে স্বীয় জীবনের এবং মনের পাপকে বৃদ্ধি করার চেয়েও মৃত্যুকে অনেক শ্রেয় বলে মেনে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেয়।

কিন্তু যাঁরা সংসারে অপাপ বিদ্ধ, যাঁরা সংসারে থেকেও সংসারের মায়া বন্ধনে নিজেকে সঁপে দেননি তাঁদের কথাই অনেক স্বতন্ত্র।—কেননা, তাঁরা আশক্তিবিহীন শুদ্ধ ভালবাসা দিয়েই, সংসারের যত আপদ বিপদকে আর মৃত্যু ভয়কেও জয় করতে পারেন। আর যিনি এই মৃত্যু ভয়কে জয় করেছেন, তিনিই কেবলমাত্র মুক্তি পথের সন্ধান পান। আর যাঁরা এই মৃত্যুকে ভয় করেন, এবং নিজের জীবনকে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবেন তাঁদের জন্য এই পথ নয়। তাঁরা কখনো সন্ধান পান না মুক্তির আলোর। কিন্তু রামপ্রসাদ এই সকলের কিংবা তীর্থ পথযাত্রীদের থেকেও স্বতন্ত্র। কেন না, রামপ্রসাদ সমস্ত ভয় ভাবনাকে জয় করে নিয়েছেন অভয়ার অভয় পদে আশ্রয় নিয়ে। ভয়কে ভাবনাকে জয় করে নিয়েছেন অনাশক্তভাবে। তাই ত যে মুহূর্তক্ষণে কাশীর অন্নপূর্ণা আদেশ করেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন, সেই মুহূর্তক্ষণেই দ্বিধাবিহীনভাবে দুর্গম ও বিপদ সঙ্কুল পথের মাঝে নেমে পড়লেন।—একমাত্র অভয়ার অভয় পদ স্মরণ করে। তাঁরই অভয় পদতলে আশ্রয় নেবার জন্য।

রামপ্রসাদ পথ চলেছেন কাশীর দিকে। নিঃসঙ্গ পথযাত্রী হয়ে। উদার-উদাস কণ্ঠে অভয়ার নাম গান করতে করতে।

বরাভয়দায়িনী জগন্মাতারই নাম গান করতে করতে। গভীর নিশুতী রাতে, রামপ্রসাদ পথ চলেছেন।

নিশুতি রাতের প্রকৃতিদেবীর ঘোমটা পরা রূপের সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার মতন মনের প্রবৃত্তি নেই, খেয়াল নেই কোন

দিকে। ভাবনা চিন্তা নেই মায়াময় সংসারের। একমাত্র চিন্তা তার, একমাত্র ভাবনা তাঁর অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে আদেশ করেছেন, তাঁকে কাশী গিয়ে গান শুনিয়ে আসবার জন্য।

রামপ্রসাদ একা পথ চলেছেন, দিনের পর দিন, আর রাতের পর রাত বিরাম-বিশ্রামবিহীন ভাবে। উপরন্তু আহার নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে গেছেন। মনের মধ্যে সব সময়ে একটি সুর একটি ভাবনা বার বার ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। আমার ধর্ম-কর্ম, অর্থ-কাম, মোক্ষ, আশা আর স্বপ্ন সকলই ত তোর চরণ তলে নিঃশেষ করে অঞ্জলি দিয়ে, নিঃস্ব হয়েছি ; তবুও তোর চরণ দু'খানি কোথাও পেলাম না!

মা' গো, তোর ছলনার অন্ত নেই! ছলনা ভরে দেখা দিলি, কিন্তু তোর অভাগা সন্তানকে ধরা দিলি না! শুধু আদেশ করে গেলি, গান শুনিয়ে আসবার জন্য। তাই ত—আজ আমি পথের পথিক!

এমনিভাবে রামপ্রসাদ আত্মসমাহিত ভাবে পথ চলতে লাগলেন। এবং আপন ভাবে বিভোর হয়ে মাতৃনাম গান ধরলেন—

"মনরে ভালবাস তাঁরে।
যেজন নে-যায় ভবসিন্ধু-পারে॥
এই কর ধার্য কিবা কার্য অসার পসারে॥
ধনজনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে।
সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী-কোলে আছ পড়ে কারাগারে॥
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, প্রতিকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদাশিবাগারে।
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম, সুধাও রসনারে॥"

রাম প্রসাদের কণ্ঠের সঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনা, নিশুতী রাতের স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে দিচ্ছে। রামপ্রসাদ এগিয়ে চলেছেন, কত গ্রাম-নগরকে পশ্চাতে রেখে, কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আত্ম-সমাহিত ভাবে। কণ্ঠে শুধু একমাত্র মাতৃনাম।

সীমাহীন পথ! আর এই সীমাহীন পথ কবে অতিক্রম করে, কোন সময়ে এসে দাঁড়াবেন পুণ্যতীর্থ কাশীতে, কবে যে এই পুণ্যতীর্থ কাশীর অন্নপূর্ণার চরণ তলে আশ্রয় নেবেন তার ঠিক ঠিকানাই বা কে জানে!

যতই সময় লাগুক, যতই দিন অতিবাহিত হয়ে যাক্ না কেন তবুও তাঁকে কাশীর অন্নপূর্ণার চরণ তলে বসে, তাঁরই কণ্ঠে শোনাতে হবে মায়ের নাম গান!

* * *

রামপ্রসাদ পথ চলেছেন। সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ।

আহার-নিদ্রা বিহীন ভাবে, একটানা পথ এগিয়ে চলেন পুণ্য তীর্থ কাশীর দিকে। একমাত্র তাঁর ভাবনা, কবে, কোন সময়ে তিনি কাশীর অন্নপূর্ণার কাছে মাতৃনাম গান শোনাবেন। শুধু একই চিন্তা: শুধু একই ভাবনা।

এই একটানা বিরাম-বিশ্রামহীন ভাবে পথ চলা আর একই ভাবনা ভাবতে ভাবতে রামপ্রসাদের দেহমন ক্রমশঃ যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এমন কি ক্রমে ক্রমে তাঁর চলচ্ছক্তি পর্যন্ত রহিত হয়ে আসতে লাগল। তবুও তিনি এতটুকুর জন্য মনের মধ্যে কোন দ্বিধা বা সংকোচকে স্থান দিলেন না। শুধু এক মাত্র অভয়ার অভয় পদে আশ্রয় নেবার আশায়, মনের মধ্যে আশার বীজ রোপন করতে লাগলেন।

এমনি করে অভয়ার অভয় পদের কথা ভাবতে ভাবতে আরো কয়েকটা দিন পথ চললেন রামপ্রসাদ। কিন্তু, তাঁর ক্রমঃভঙ্গ সমস্ত দেহটা যেন আরো ভেঙ্গে গেল। এমন কি আর এক পদও তাঁর শ্রান্ত দেহ নিয়ে অগ্রসর হতে পারলেন না। তাই তাঁর এই

শ্রান্ত দেহটাকে কোন ক্রমে টেনে নিয়ে এলেন একটা ছায়াবৃত বটবৃক্ষের নীচে। কেননা, এই ছায়াবৃত বট বৃক্ষের নীচে একটু খানি বসে বিশ্রাম নেবার আশায়।

তখন দিনমান সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে আবীর রঙ ছড়িয়ে দিয়ে অস্তমিত হবার আয়োজন চালিয়েছে। এবং এই আবীর রঙের খেলা, পশ্চিমাকাশের বুক থেকে আর অল্পক্ষণ পরে বিলীন হয়ে গিয়ে নেমে আসবে পৃথিবীর বুকের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারের কালো যবনিকা!

নেমে আসে নিরব এক অতি ভয়ঙ্কর কালো রাত্রি। আর তারই সঙ্গে দিনমান বিহগদের কল কাকলি স্তব্ধ হয়ে যায়। জেগে ওঠে রাতের সহচর কয়েকটা শিবার বিকট আবার ধ্বনি। আর সেই মুহূর্তক্ষণে রামপ্রসাদের শ্রান্ত দেহটা গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে সেই বটবৃক্ষের তলে।

এমনি ভাবে কতক্ষণ যে নিদ্রার কোলে পড়ে রইলেন তার কোন হিসেব নেই। শুধু সন্ধ্যাদেবী তাঁর কালো ওড়নাখানা সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর টেনে দিয়ে তার বিজয় শকটখানি দ্রুত, অতি দ্রুত চালিয়ে দিয়েছেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তক্ষণে কোন একটা গাছের ডালে বসে একটা পেঁচক বার দুই তিন বিকট ভাবে ডেকে উঠে, আবার নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায়।

ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে রামপ্রসাদ নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন! যেন, কাশীর অন্নপূর্ণা স্বয়ং এসে রামপ্রসাদকে বলছেন— দেখ, রামপ্রসাদ তোকে কাশীতে যেতে হবে না! আর কিছুটা পথ আগিয়ে গেলে একটা মন্দির দেখতে পাবি। আর সেই মন্দিরে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছি। তুই সেখানে গিয়ে আমায় গান শোনালে আমি তোর কণ্ঠের গান শুনতে পাব।

স্বপ্নের মধ্যে অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা মা, স্বয়ং আদেশ জানিয়ে আবার নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। কাশীর অন্নপূর্ণা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রামপ্রসাদের নিদ্রার

ঘোর টুটে গেল। আর নিদ্রার ঘোর টুটে যেতেই রামপ্রসাদ আকুল আর্তনাদ করে ওঠেন, মা—মা—মাগো!

রামপ্রসাদের কণ্ঠের সেই মাতৃনাম যেন সমস্ত আকাশ বাতাস মথিত হয়ে উঠল; সেই মাতৃনামে নিশুতী রাতের স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে দিয়ে পরম ব্রহ্মময়ীর, পরম ওম্ কার ধ্বনি, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে একটা মন মোহনিয়া সুরের ঝংকারে ঝংকারিত হয়ে উঠল।

জেগে উঠেই রামপ্রসাদ আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর সমস্ত অন্তর ব্যাপী তখন শুধু একটি মাত্র ঝংকাবই ঝংকাবিত হয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। সেই ধ্বনি কেবল মাতৃনামের ধ্বনি।

আর জেগে ওঠে তাঁর মনের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া অন্নদায়িনী মা অন্নপূর্ণার আদেশের কথা।

স্বপ্নে অন্নপূর্ণা মায়ের সেই আদেশেব কথা মনের মধ্যে জেগে উঠতেই রামপ্রসাদ আর কালবিলম্ব করতে পারলেন না। আর এতটুকু সময় নষ্ট না করে আবার পথ চলতে লাগলেন।

সীমাহীন বন্ধুর পথ।

এমনি করে এক প্রহর রাত পর্যন্ত বন্ধুর পথ চলার পর অবশেষে একটা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এবং মন্দিরেব সামনে এসে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন মন্দিরের দিকে।

তখন তাঁর সমস্ত অন্তর ব্যাপী শুধু একটি মাত্র ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল। এই জগতের অন্ন প্রদায়িনী অন্নপূর্ণারই মন্দির।

তাঁর অন্তর ব্যাপী যখন এই ধ্বনিই বার বাব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে থাকে তখন তিনি আবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন মন্দিরের দিকে। এবং তাকাতেই তিনি যেন দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন, মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা হয়ে রয়েছেন অন্ন প্রদায়িনী জগৎ মাতা অন্নপূর্ণা। আর দীন ভিখারীর বেশে জগৎ পিতা সর্বত্যাগী মহেশ্বর অন্নভিক্ষা করছেন,—'ভিক্ষাং দেহি হে মাতো অন্নপূর্ণে' বলে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন রামপ্রসাদ। ভাবের ঘোরে মাতৃনাম গান করতে লাগলেন তিনি—

"আর কাজ কি আমার কাশী ?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দসাগরে ভাসি।
ওরে কালীপদে কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা।
ওরে অনলদাহন যথা করে তূলারাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুনানিধির বলে।
ওরে চতুর্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥"

রামপ্রসাদের সমস্ত মন যেন আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগল। এমনি ভাবে আনন্দের সাগরে ভাসতে ভাসতে রামপ্রসাদ আরো কয়েকটা মাতৃনাম গান করতে লাগলেন।

আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, একটা অজানিত আনন্দানুভুতি পেতে লাগলেন, এই ক্ষণকাল পূর্বে মনের মধ্যে যে বেদনা আর আকুল কান্নার ভাব বর্তমান ছিল, তা' মাতৃনাম গানের আনন্দের ধারায় সমস্ত ভেসে গেল।—শুধু তাঁর ত্ন'নয়ন থেকে একটা আনন্দাশ্রু ঝরে পরতে লাগল।

রামপ্রসাদ আবার গাইলেন—

"মন ভেবেছে তীর্থে যাবে।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজি কূপে পড়ে আপন খাবে ॥
ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জ্বরে কাশী সর্বনাশী ত্রিবেনী স্নানে রোগ বাড়াবে ॥
কালীনাম মহৌষধি, ভক্তিভাবে পানবিধি,
ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্মা হবে।

মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেথায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাতে পরমাত্মায় মিশাইবে ॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি কল্পতরুছায়া,
ওরে কাঁটাবৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ॥"

তখন রাতের স্তব্ধতাকে ধীরে ধীরে বিলীন করে দিয়ে আগামী দিনের নবীন সূর্যের উদীয়মান হবার বার্তা ঘোষিত হয়েছে।
আর তারই সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে পূর্বাসার বুকে আলো আঁধারীর, আলো ছায়ার একটা লীলাখেলা। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে দিয়েছে এক বৈচিত্রময় আগমনী সঙ্গীত।

আর রামপ্রসাদ ?

রামপ্রসাদ জগন্মাতা অন্নপূর্ণার ধ্যানে, মাতৃনাম গানের ভাবে বিভোর হয়ে আবিষ্ট হয়ে রইলেন।—তার এই আবিষ্টের মধ্যে তার সমস্ত বাহ্যিক সত্ত্বাই বিলোপ হয়ে গিয়েছিল।—আর লীন হয়ে গেল তার মন-প্রাণ অভয়ার অভয় পদে !

॥ এগার ॥

রামপ্রসাদ আবার ফিরে এলেন হালিশহরে।

ফিরে এলেন কাশী যাবার মাঝ পথ থেকে !—জগন্মাতার আদেশে আর তাঁকে সুদূর কাশীধাম পর্যন্ত ছুটে যেতে হয়নি অন্নপ্রদায়িনী জগন্মাতা অন্নপূর্ণার মন্দির পর্যন্ত। কেননা—

কাশীর অন্নপূর্ণা মা ই স্বয়ং স্বপ্নাদেশের মধ্যে রামপ্রসাদকে বললেন ;—'ওরে তোকে আর আমার 'থান' পর্যন্ত যেতে হবে নারে ! কাছেই আমার প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে, সেখানেই গিয়ে আমায় তুই গান শোনালে আমি শুনতে পাব।"

এই স্বপ্নাদেশে রামপ্রসাদ সেই বর্ণিত অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়ে পর পর কয়েকটা মাতৃনাম গান গেয়ে আবার হালিশহরে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন মনের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে—যে আনন্দ অন্তরের অন্তিমস্থল থেকে উদ্ভূত হয়ে,—হৃদয়ের পঙ্কিলতা নামক

যেসব দুঃখ-বেদনা, সুখ, ভোগ-বাসনা, কামনা আছে তা থেকে মনকে মুক্ত করে দিয়ে ; মনকে সচ্চিদানন্দময় করে তুললেন ; ধুইয়ে দিলেন, পরিপূর্ণ বারিধারায়, রামপ্রসাদের সমস্ত অন্তরটাকে !—আর সেই পরিপূর্ণতায় তাঁর সমস্ত অন্তর ব্যাপী শুধু মাত্র একটা ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল ;—'মাতৃনাম গান। উপরন্তু তাঁর সমস্ত সত্বা দিয়ে এটাই উপলব্ধি করতে লাগলেন—'সর্বজীবাত্মাই 'মা' !—'ধ্যান-জ্ঞান, জপ-তপই মা !' অর্থাৎ—

মা' ই জগৎ সংসারে জীবন সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়।

'শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়,' শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছিলেন ;—'দেখ পার্থ ! এই জগতে দ্বিতীয় কেবা আছে আর ?

'জল-স্থলে অন্তরীক্ষে দেখিবে আমারে !'

তার পরেই আবার বলেছিলেন ;—

'মীনরূপে খেলি আমি
অনন্ত সাগরে।
কুর্মরূপে রক্ষি আমি—
প্রকৃতি পৃথিবীরে ॥
আর আর যাহা দেখ হে পার্থ,
জানিবে সকলি আমারে।
কাল রূপে মহা কাল আমি,
'যম রূপে, আমিই সকলি
সংহার করি ॥"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেই আছে ;—

বর্ণ ক্ষেত্র শুম্ভকে জগন্মাতাই বলেছেন ;—

'এই জগতে দ্বিতীয় কেবা আছে আর।
যাহা দেখে সবই—
বিভূতি বর আমার।"

অর্থাৎ 'এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি রূপে' বিরাজিত হয়ে থাকেন। রামপ্রসাদ এই ধ্রুব সত্যটাকে যে মুহূর্তেই সম্যকরূপে উপলব্ধি

করলেন; সেই মুহূর্তক্ষণেই, তাঁর জীবনসর্বস্ব আরো প্রকট, আরো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। আর সেই উজ্জ্বলতাকে, সেই পবিত্রতাকে, আরো উজ্জ্বলতম করবার জন্য; আরো পবিত্রতম্ করবার জন্য মাতৃনাম গানের মধ্যে রামপ্রসাদ জীবন সমর্পন করলেন। তাই ত হালিশহরে ফিরে এসেই একমাত্র মাতৃনাম গানের মধ্যে নিজের জীবন মনকে ডুবিয়ে দিলেন —

"তোমার কে মা বুঝবে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে॥
তুমি দিয়ে নিচ্ছ তুমি, বাছ রাখ না সাঁঝ সকালে।
তোমার অসীম কার্য অনিবার্য মাপাও যেমন যার কপালে॥
তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী, ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেও তুমি ভাসাও শিলে॥
তোমার জারিজুরি আমার কাছে খাটবে না মা কোন কালে।
ও সব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে॥"

রামপ্রসাদের মন, একমাত্র অভয়ার অভয় পদ পাবার আশায় বার বার কাতর হয়ে ওঠে। কিন্তু—তাঁর এই আকুলতায় জগন্মাতা নানা রূপে, নানা কৌতুক রঙ্গে আর ছলনার মধ্যে খেলা খেলতে থাকেন। আর রামপ্রসাদ তাঁর লীলা ভরা রঙ্গ খেলা দর্শন করতে লাগলেন। কখনো আকুল হয়ে মা—মা বলে ক্রন্দন জুড়ে দেন। আবার কখনো বা অভিমান ভরে বলে বসেন, আর তোকে মা বলে ডাক্‌বো না।

কিন্তু জগন্মাতা যেমনি পাষাণের মেয়ে, ঠিক তেমনি পাষাণের বেটী হয়ে, নীরব হয়ে থাকেন। আর নীরবেই খেলা করেন ক্রন্দনরত অভিমানী সন্তানের সঙ্গে।

রঙ্গময়ী অভিমানী সন্তানের সঙ্গে যতই রঙ্গ ভরে খেলা করেন, ততই অভিমানী সন্তান ক্রন্দন বিজড়িত স্বরে মায়ের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে গালি দিতে আরম্ভ করেন—

'বড়াই কর কিসে গো মা।

জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে॥

আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, থাক ক্ষেপা-সহবাসে।

তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা তুমি কোন্ পুরুষে॥

মাগীমিন্সে ঝগড়া ক'রে রইতে নার আপন বাসে।

মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা ক'রে ফিরে কেন দেশে দেশে॥

প্রসাদ বলে মন্দ বলি, কেবল তোমার বাপের দোষে।

মাগো আমার বাপের নাম লইলে বিরাজ করে কৈলাসে॥"

হাজার বার গালি দিয়েও, লীলাময়ী জগন্মাতার এমনি ধারা লীলা খেলা থেকে তাঁকে বিরত করতে পারেন না। তবুও তাঁর লীলা খেলার কোন অন্ত থাকে না। তাই রামপ্রসাদ তাঁর এই রঙ্গময়ী লীলা খেলাতে অস্থির হয়ে ওঠেন। এবং যতই অস্থির হয়ে ওঠেন, ততই গালি দিয়ে এই অস্থিরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু—এত চেষ্টা করেও জগন্মাতার এই রঙ্গ খেলার হাত থেকে ক্ষণিকের জন্যও মুক্তিলাভ করতে পারলেন না রামপ্রসাদ। তাই হতাশ হয়ে, অভিমান ভরে কান্না জুড়ে দিলেন। আর সেই কান্নার ভিতর দিয়ে আকুল কণ্ঠে বলতে থাকেন, মা! মাগো আর কত তুই ছলনা করবি মা! আর কত দুঃখ দিবি মা? শুধু একটি বার দেখা দে মা, শুধু একটি বার দেখা দে মা!

দেখা দে মা, তোর অপরূপ রূপ মাধুরী নিয়ে, দেখা দে মা। তোর সেই জ্যোতির্ময়ী রূপ নিয়ে একটি বারের জন্য আমার সামনে এসে দাঁড়া মা! আমি একটি বারের মতন প্রাণ ভরে দেখে নি' মা!

রামপ্রসাদের অন্তরের আকুল ক্রন্দন যেন থামতে চায় না। তাই তিনি তেমনি আকুলতার ভিতর দিয়ে বার বার জগন্মাতাকে আকুল হয়ে জানান, মা! মাগো তোর অভাগা সন্তানকে, প্রসন্ন হয়ে দর্শন দে মা। দর্শন দে!

'বিশ্বেশ্বরীর' কাছে আকুল প্রার্থনা জানান রামপ্রসাদ। প্রার্থনা

জন্য তোমার রামপ্রসাদকে দর্শন দাও। শুধু একটি বারের জন্য।

রামপ্রসাদের অন্তরের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, একমাত্র বাসনা জগন্মাতার দর্শন লাভ করা। কিন্তু হাজার কান্না-কাটি, হাজার বার আকুলতা জানিয়েও মায়ের দর্শন পান না। অর্থাৎ জগন্মাতাই তাকে দর্শন দেন না, তাঁর অপরূপ রূপ নিয়ে। শুধু লীলাময়ী জগন্মাতা তাঁর নানা রঙ্গ খেলার মধ্যে, তাঁর নানা লীলা খেলায়, ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়ে আবার কোথায় লুকিয়ে পড়েন।

এমনি লীলা খেলায় রামপ্রসাদ তাঁর অতৃপ্ত মনে এতটুকু শান্তি পান না। আর পাবেনই বা কি করে? লীলাময়ী যদি এমনি করে সন্তানের সঙ্গে লীলা খেলা খেলেন তাতে কি কোন সন্তান শান্তি পেতে পারেন?

তাইত রামপ্রসাদ জগন্মাতার এমনি লীলা খেলায় শান্তি না পেয়ে অশান্ত অতৃপ্ত মনে গেয়ে ওঠেন,—

"আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকবো না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে।
কিন্তু এমন কল করেছে কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে॥
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাষে।
আমার সেই যে কালী, মনের কালি,
হ'লেম কালি তার বিষয়বশে॥"†

---

† সাধক রামপ্রসাদের কালে দ্বিজ রামপ্রসাদ ও দীন রামপ্রসাদ নামে আরো কয়েক জন রামপ্রসাদের নাম আমরা দেখতে পাই। এঁরাও সকলেই মায়ের গান রচনা করতেন। তবে সাধক কবির মত মাতৃ দর্শন লাভাকাঙ্খায় পাগল হয়ে উঠেছেন বলে কোন নজির আমরা দেখতে পাই না। তবে রামপ্রসাদের দেখা-দেখি দ্বিজ ও দীন রামপ্রসাদ মায়ের গান রচনা করতেন। কালক্রমে তাঁদের এই সব গানগুলি সাধক কবির মাতৃনাম গানের সঙ্গে প্রায়ই অঙ্গাঙ্গিভূত হয়ে গিয়েছে।

এমনি ভাবেই রামপ্রসাদ মায়ের জন্য, অর্থাৎ—মা'কে পাবার জন্য ক্রমশ উন্মাদ হয়ে উঠতে লাগলেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত সত্বাও ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগল; আহার-নিদ্রা, অসন-বসন সব কিছুই তিনি ক্রমশ ভুলে যেতে লাগলেন।

দিবা-নিশী একমাত্র তাঁর সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে মাতৃনাম গান। তাঁর সমস্ত অন্তর ব্যাপী জগৎ মাতাই সর্বস্ব হয়ে রয়েছেন। আর অন্তর বাসিনী শ্যামা মা-ই অন্তরে বিরাজ করতে লাগলেন সাধকের। কিন্তু এদিকে, কাশী যাবার পথ থেকে ফিরে আসার পর, সর্বাণী দেবী লক্ষ্য করলেন যে তাঁর স্বামী কিসের এক উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। তাই তিনি স্বীয় স্বামীর এই উন্মাদনা ভাব লক্ষ্য করে কেমন যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি এর কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তাই সর্বাণী দেবী নিজের মনেই ভাবলেন, —না জানি জগন্মাতার এই কি লীলা খেলা। আর কিবা তাঁর অভিপ্রায়।

জগন্মাতা মহামায়া, যতই লীলা খেলা খেলুক না কেন, আর যতই অভিপ্রায় থাকুক না কেন,—সর্বাণী দেবী তার কোন হদিস খুঁজে পেতে চান না। শুধু অন্তরের একমাত্র নীরব আবেদন জানান সর্ব দুঃখ হারিনী মহামায়া, মহাশক্তির অভয় চরণ তলে —মা গো, তুই ত সর্ব দুঃখহারিনী নাম নিয়ে, জগতের দুঃখ বেদনাকে বিনাশ করিস। তাই তোর চরণ তলে আমার এই আবেদন যে আমার মনের মধ্যে কোন দুঃখ-বেদনার চিহ্ন রাখিস না। যদি দুঃখ দিতে চাস দিস্, কিন্তু সহ্য করবার শক্তিটাও যেন দিতে ভুল করিস না মা।

সর্বাণীদেবী মনে মনে আরো প্রার্থনা জানান, সর্ব শক্তির আধার মহামায়ার চরণ প্রান্তে। প্রার্থনা জানান, মাতৃনামে পাগল, মাতৃঅন্ত প্রাণ স্বীয় স্বামী রামপ্রসাদের জন্য—মা! মাগো! তোর নামে পাগল তোর সন্তানকে সব সময় রক্ষা করিস মাগো!—তুই যে 'রক্ষাকালী', কালী তারা ব্রহ্মময়ী তুই যে মা! তুই যদি রক্ষা না করিস এই বিশ্ব সংসারে আর কে বা রক্ষা করতে পারে।

এর থেকে আর বেশী কিছু প্রার্থনা বা আবেদন জানাতে পারলেন না সর্বাণী দেবী। তাছাড়া আর—জানাবেনই বা কি? যাঁর ইঙ্গিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত, যাঁর সুঁতোর টানে জগৎ সংসারের প্রতিটি জীব জীবন দর্শনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে—যাঁর একটা অঙ্গুলী সঞ্চালনে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সূচনা সূচিত হচ্ছে, তাঁর কাছে আর বিশেষ কি আবেদন জানাবেন? কিন্তু—রামপ্রসাদ?

রামপ্রসাদের অন্তরের আকুল আকুতির অন্ত নেই।—তাই ত এই আকুলতার ভেতর দিয়ে বারে বারে অন্তরের আবেদন রাখেন জগন্মাতার চরণের উদ্দেশ্যে—

"মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কতদিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি।
প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥

একমাত্র অভয়া, অভয় বরদায়িনী মা জগন্মাতা, জগন্মোহিনী মহামায়ার নাম গানামৃতের মাঝে ডুবে থাকেন রামপ্রসাদ। অন্তরের অন্তর্যামিনী শ্যামা মায়ের নানা লীলার কথা, নানা ছলনার কথা নাম গানের মধ্যেই প্রকাশ করে আক্ষেপ করতে থাকেন। কখনো বা আবদার করেন জগন্মাতার কাছে। আবার কখনো বা অভিমান ভরে গালিও দিতে ছাড়েন না রামপ্রসাদ।

শুধু কি তাই! জগন্মাতার সাথে কৌতুক রঙ্গ খেলা খেলতে ছাড়েন না। তাই কৌতুকচ্ছলে সানন্দে গাইতে থাকেন রামপ্রসাদ—

মন গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমি নাচাও তেমি নাচে॥
তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম, মর্মকথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥

তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে কর্মসূত্র সে সুতায় কাট্‌না কেটেছে।
সেই মায়াসূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপা-ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥

॥ ১২ ॥

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন হালিশহরে।

তাঁর বিশাল রাজ্যের মধ্যে এ একটি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রাতীত গণ্ড গ্রাম মাত্র। তবুও তাঁকে আসতে হলো রাজভক্ত অনুচরদের ঐকান্তিক আগ্রহের জন্য।

ধর্ম-প্রাণ-মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। প্রজাদের মনোরঞ্জনকারী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, হালিশহরে এসেছেন,—আপন প্রজাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য—তাদের মনে শাস্তি দানের জন্যই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন হালিশহরে। এসেছেন তিনি অনাথ দুঃখীদের দুঃখ দূর করবার জন্য, জ্ঞানীগুণীদের উপযুক্ত মর্যাদা দানের জন্য। আর যারা অন্যায়কারী তাদের উপযুক্ত সাজা প্রদান করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। প্রজাদের সুখ-দুঃখ রাজার সুখ-দুঃখ। আর প্রজাদের সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করাই যে রাজার ধর্ম।

শাস্ত্রকারেরাও বলেছেন, সর্ব ধর্মের সার ধর্ম হচ্ছে ন্যায় ধর্ম। কিন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে দান ও সেবা। যে দানের মধ্যে প্রতিদানের কোনরূপ প্রত্যাশা নেই, আর যে সেবার মধ্যে কোনরূপ বাসনা থাকে না, এইরূপ দান ও সেবা ধর্মই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তা নয়, এ শ্রেষ্ঠাতীত। আর ন্যায়ধর্ম—ন্যায়ধর্ম কেবল ন্যায়ের পথ ধরে শুধু মাত্র ন্যায় বিচার করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে। আর যে অন্যায়কারী অন্যায় করে চলেন, অবিচার করে চলেন অথচ সেই অন্যায় ও অবিচারকে

ন্যায় বলে প্রচার করতে এতটুকু দ্বিধা করেন না যাঁরা, আমাদের সমাজ, শিক্ষা-দীক্ষাই এঁদেরকে অন্যায়কারী দুরাচার বলেন। কিন্তু যিনি দেশের রাজা, তিনি যতই জ্ঞানী ও গুণী হউন না কেন, তাঁর মধ্যে ন্যায় ধর্মও থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা যে ব্যক্তি অন্যায়কারীকে কঠোর শাসন না করে, তাঁর ভুল-ভ্রান্তিকে সংশোধন করে দিয়ে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারেন ; এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে তুল্য-মূল্য বিচার করবার শক্তি অর্জন করে থাকেন ; তিনি রাজন্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও ঠিক এই ধরনের রাজা ছিলেন। সত্যের আর ধর্মের জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে এতটুকু পরাঙ্মুখ হতেন না। তা ছাড়া—দীন-দুঃখীদের দান-ধ্যান ও প্রতিপালন করায় তাঁর মধ্যে এতটুকু কৃপণতা প্রকাশ পেতো না। শুধু তা নয় অন্যায়কারী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের ন্যায় ও সত্যের পথে আনবার জন্য চেষ্টা করতে এতটুকু দ্বিধা অনুভব করতেন না। যদি তারা ন্যায় ও সত্যের পথকে অবহেলা করে অন্যায়টাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকত ; তা'হলে সেখানে কঠোর হস্তে শাসন করতে একটুর জন্যও তাঁর হাত কেঁপে উঠত না।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অনুরক্ত প্রজাবৃন্দদের একান্ত ইচ্ছায় এসেছেন হালিশহরে। এই হালিশহরে এসেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিরাট রাজসভা করে বসেন। তিনি তাঁর অনুগত ভৃত্যদের আদেশ দিলেন যে, তাঁকে দর্শন করবার জন্য দীন-দুঃখী, অনাথা যে-ই আসুক না কেন, কাউকেই যেন কোনরূপ বাধা প্রদান না করা হয়।

সর্বসাধারণের জন্য কিংবা সর্বশ্রেণীর লোকেদের জন্য সদা দ্বার যেন মুক্ত রাখা হয়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই আদেশের সংবাদ জানতে পেরে এই হালিশহর গাঁয়ের সমস্ত গ্রামবাসীরা একে একে এসে রাজদর্শন করে যেতে লাগলেন। কেউবা ঈশ্বরের কাছে মহারাজের জন্য মঙ্গল কামনা করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে যেতে লাগলেন। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বা রাজদর্শনের নজরানা দিয়ে মহারাজকে প্রণাম জানান। আর

তাদের মধ্যে যারা চিরদুঃখী: তারা দুঃখ-দুর্দশার কথা রাজ সমীপে নিবেদন করে। শুধু তা নয়—তাদের মধ্যে যাঁরা বর্ণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রাজ দর্শনে এসে নানাবিধ স্বস্তি বচন আওড়িয়ে মহারাজের দীর্ঘায়ু কামনা করে,—বিদায় গ্রহণ করে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

মহারাজের অনুগত ভৃত্যরা তাঁদের প্রত্যেকের সঠিক পরিচয় প্রদান করে বলে যেতে লাগল;—মহারাজ। ইনি ন্যায়বিদ্। ন্যায় শাস্ত্রের এখন অগাধ পাণ্ডিত্য সমগ্র বাংলাদেশে আর দুটি খুঁজে পাবেন কিনা সন্দেহ। আর এনাকে দেখছেন মহারাজ, ইনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও সিদ্ধপুরুষ। এবং এনার মতন এতবড় বৈদান্তিক আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। আর ইনি?

ইনি হচ্ছেন সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শী। ন্যায়, বেদ বেদান্ত আর উপনিষদ প্রভৃতি সনাতন হিন্দু ধর্মে যতগুলি শাস্ত্র প্রচলিত আছে সবই এনার নখদর্পণে।—আপনার বিশাল রাজ্যের মধ্যে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুরুষ আর দু'জন খুঁজে পাবেন না।

রাজঅনুগত ভৃত্য একে একে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরিচয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে নিবেদন করে, তাঁদের সকলের গুণ কীর্ত্তন করে, আর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁদের সকলের গুণগান শুনে, তাঁদের সকলকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁদের সকলকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়ে বিদায় করেন। এমনি ভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে থাকে। এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরও এমনি করে হালিশহরে পরমানন্দে দিন কাটে।

কিন্তু শত আনন্দের মধ্যে কাটালেও তাঁর মনের মধ্যে যেন কোথায় একটু শান্তির ব্যাঘাৎ ঘটছিল। এমনি, একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নীরবে বসে মনের এই ব্যাঘাতের কারণটাই অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলেন, আর মনে মনে ভাবছিলেন, তাঁর স্বীয় রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নানা জাতির বসতিপূর্ণ এই হালিশহর গ্রামে কাটাচ্ছেন একটা পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে। অথচ এই পরিপূর্ণ

শান্তিনিকেতনকে কেমন করে পরিত্যাগ করে তিন স্বীয় রাজ্যে ফিরে যাবেন! মন যেন এই ক্ষুদ্র গ্রামটিকে পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে চাইছে না। এমনিধারা নানা কথা ভাবছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। এবং ভাবতে ভাবতে তিনি একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন।—ঠিক তেমনি সময় তাঁর সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে একেবারে ওলট-পালট করে দিয়ে তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলে দিলেন কে যেন! আর শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলে দিতেই, তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন আকুল স্বরে গাইছেন—

"আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে শিবের কাছে॥
ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে॥
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হ'য়ে, শিব ওপদ বাঁধা রেখেছে॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে আমায় নিরংশী করেছে॥"

সমস্ত অন্তরের আকুল আবেদন জানাতে থাকেন সদানন্দময়, আত্মভোলা রামপ্রসাদ তাঁর মাতৃনাম গানের মাধ্যমে। কত আকুল আবেদন; কত আকুল আকুতি তাঁর ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। 'রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে আমায় নিরংশী করেছে।'

আর সেই মাতৃনাম গান শুন্‌তে পেলেন, ভক্তি-প্রাণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং সেই মাতৃনাম শুন্‌তে শুন্‌তে একটা পরিপূর্ণ শান্তির ভাব অনুভব করতে লাগলেন। আর তারই সাথে সাথে ভাবতে লাগলেন, কে? কে এই রামপ্রসাদ? সংসারের সমস্ত মায়ার বন্ধনকে মুক্ত করে দিয়ে, বিশ্বজননীর অভয় পদে নিজেকে লীন করে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন! কিন্তু—

কই! কখনো ত তাঁর কোন স্তাবকের দলকে এই রামপ্রসাদের

নাম উচ্চারণ করতে শোনেন নি।—তবে কি ইনি এই হালিশহরের লোক নয়?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন এমনি নানা ভাবনার মধ্যে এবং নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন, ঠিক তেমনি সময় তাঁর সমস্ত ভাবনা-দ্বন্দ্বের জালকে ছিন্ন করে দিয়ে রামপ্রসাদ আপন খেয়ালে গেয়ে চলেন, কোথায় কোন দূর থেকে—

"কাজ কি, মা! সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, প'ড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায অভয় চরণ, রাখি হৃদি-পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা ক'রে মা, যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিমকালে জয় দুর্গা ব'লে
স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥"

জগন্মাতার কাছে অন্তরের একমাত্র আকুতি জানান রামপ্রসাদ, অন্তিমকালে অভয়ার একমাত্র অভয় পদে স্থান পাবার জন্য। আর তাঁরই এই আবেদন, এই আকুল আকুতি শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমস্ত অন্তরটার মধ্যে যেন অমৃতের ধারা বর্ষণ করতে লাগল। আহাঃ! বড়ই সুন্দর! অপূর্ব সুরঝঙ্কার! নিজের মনেই ভাবলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। সার্থক!—সার্থক তোমার মাতৃনাম গান। সার্থক তোমার জীবন।

কথাগুলি ভাবতে ভাবতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েন। এবং এমনি আনমনা ভাবে রামপ্রসাদের গাওয়া মাতৃনাম গানের শেষ চারণটি বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন। মাগো, আমার অন্তিমকাল যখন এসে দাঁড়াবে, তখন জয় দুর্গা জয় দুর্গা বলে তোমার চরণতলে একটুখানি স্থান যেন পাই। মাগো—

মাতৃনাম গানের শেষ চরণ দুটি আবৃত্তি করতে গিয়ে, মহারাজার

দু'নয়নের দুটি অশ্রুধারা নেমে আসে। আর তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে থাকেন, আহাঃ! জগন্মাতার এমন ভক্ত না হলে কি কেউ এমন কথা বলতে পারে! ভাবলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। হাঁ, কল্যই এই মাতৃভক্ত সন্তানের তত্ত্ব আগেই নিতে হবে।

॥ ১৩ ॥

ভক্ত না হলে, ভক্তের মহিমা বুঝতে পারে না কেউ। তবে, ভক্তের মতন ভক্ত হওয়া চাই। অর্থাৎ পাকে পড়ে ভক্তের মতন ভড়ং দেখালে, আর দু'চার বার কালী-তারা-ব্রহ্মময়ী কিংবা জয় মধুসূদন বলে চেঁচিয়ে ডাকলে তাঁরা যে সত্যি কারে ভক্ত বলে গণ্য হন তা'নয়। আর তাঁরা ভক্ত প্রধানদের মহিমাও কখনো বুঝতে পারেন না। কেন না; এঁরা সংসারের জৈব ধর্মকে প্রধান্য দিয়ে, জীব ধর্মকে অ-প্রধান বলে মনে করেন।

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'যারা সংসারের ক্লীব হয়ে অর্থাৎ স্বীয় জীব ধর্মকে ভোগ-বাসনা কামনার মধ্যে আত্মাহুতি দিয়ে থাকেন তাঁদের পক্ষে ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করা যেমন অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় তেমনি তাঁদের মহিমা বোঝা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ভক্তের আর ভক্তি মাহাত্ম্য তাঁরা কোন দিন বুঝতে পারবেন না! তবে এখানে কথা উঠতে পারে, তা হলে আমরা কি করে বুঝতে পারবো ভক্ত-প্রধান কে? আর কি করেই বা তাঁদের চিন্‌তে পারব? উত্তরে আমরা বলবো, অর্থাৎ সংসারের কোনরূপ আশক্তির দাগ যাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি বা যাঁদের দেহকে সংসারের কোনরূপ কালীমা স্পর্শ করতে পারেনি, তাঁরাই একমাত্র ভক্ত। তাঁদের কেবল মাত্র ঈশ্বরের নাম গানই সম্বল হয়ে দাঁড়ায়।

এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, যাঁর মনের মধ্যে 'আশক্তি বিহীন শুদ্ধ প্রেম থাকে, তাতে থাকেনা কোন বাসনার দাগ তিনিই সত্যিকারের ভক্ত প্রবর। এবং সেখানেই ভক্তির উৎপত্তি।

কেন না, ভক্তির সঙ্গে আশক্তি বিহীন ভালবাসার একটা সমতা রক্ষা করে চলেছে। আর এমনি ভক্তি-প্রেম যাঁর মনের মধ্যে সর্বক্ষণ অতন্দ্র প্রহরীর মত জাগ্রত হয়ে থাকে, তিনি ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যিনি সদা-সর্বদা আশক্তি মুক্ত হয়ে রয়েছেন তিনিই ভক্ত। এ ভিন্ন ভক্তের আরো লক্ষণ আছে ; তা হচ্ছে—যিনি ভক্ত তিনি হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ মুক্ত হন। যাঁর মনের মধ্যে এর কোন কিছুরই স্থান নেই, তিনিই হচ্ছেন ভক্ত প্রধান। কেন না, ভক্তির সঙ্গে ভক্তের, আর ভক্তের সঙ্গে ভক্তির একটা অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রয়েছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন এমনি এক ভক্ত।

তাই রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে মুহূর্তে মাতৃনাম গান শুনলেন, সেই মুহূর্তক্ষণেই তাঁর মনের সুপ্ত ভক্তি ভাবটাই পুনরায় জাগ্রত হয়ে উঠল। তাইত, রামপ্রসাদের মাতৃনাম গান শুনেই তাঁর মনের মধ্যে জানবার জন্য একটা বাসনা জেগে উঠেছিল—কে? কে এই মাতৃভক্ত সন্তান?

ভক্তির আগল খুলে দিয়ে, মনের আকুলতা, কান্না-দুঃখ-বেদনা আর অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই ওই অন্তর্যামিনী মহামায়ার রাঙা চরণ তলে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। শুধু মাত্র ওই মহামায়ার কাছে অন্তরের সকল আবেদন জানানো ছাড়া, আর কারো কাছে জানাবার মতন এই বিশ্ব সংসারে কেউ যেন নেই। সুখের-সুখী, দুঃখের-দুঃখী আর আনন্দের মধ্যে চরম আনন্দই হচ্ছে ওই আনন্দময়ী মা'ই তাঁর জীবন-মরণের সাথী হয়ে রয়েছে। তাই ত রামপ্রসাদের ভাষায় বলতে হয়, "নিরানন্দ, আনন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সকলই একমাত্র ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে।"

শুধু কি তাই, এই বিশ্ব সংসারে সকলেই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় অর্থাৎ তুমি আমি সকলেই তাঁরই ইচ্ছায় পরিচালিত।

আমাদের এই সংসারে কেউ বা অর্থ ভোগ করছি, যশ

ইত্যাদি উপভোগ করছি। আবার কেউ বা সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথচ নেই আকৃড়া মায়ের সন্তান হতে চাই না। তাই ত সঠিক জ্ঞানী গুণীরা বলেছেন, সংসারের সকল ভোগ-বাসনা, কামনার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাও, মনকে ভক্তি বারি দিয়ে আগে ধৌত করে নাও। তারপর মনকে ভক্তির আগল দিয়ে বেঁধে নাও।

আবার বলেছেন, 'আত্মানাং বিদ্ধি'। অর্থাৎ আত্মাকে পরিবিদ্ধ কর। মনকে সংযত কর। তোমার মনের ভোগ বাসনা থেকে মনকে স্থিমিত করবার চেষ্টা কর, তা' হলে দেখবে মনের ভোগ বাসনা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়ে, সেখানে ভক্তির অঙ্কুর ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। আর তোমার মন আশক্তিবিহীন হয়ে, মুক্তির পথের দিকে এগিয়ে চলেছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনও ঠিক এমনি ভাবে চলছিল। প্রভাতে যখনই তিনি এসে রাজদরবার কক্ষে বসলেন, তখনই তাঁর মনের মধ্যে একটি নামই বার বার আনাগোনা করতে লাগল। সেই একটি নামই তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে স্থান করে নিয়েছিল। সেই নাম আর কারো নয়, রামপ্রসাদের। তাই দরবার কক্ষে এসে বসেই প্রথমে খোঁজ নিলেন এই রামপ্রসাদের। রাজদরবারে বসেই তাঁর অনুগত ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করলেন ;—আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেউ কি জান, এই হালিশহর গাঁয়ে 'রামপ্রসাদ' বলে কেউ বসবাস করে কি ?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই জিজ্ঞাসাতে, তাঁরই এক ভৃত্য স্ববিনয়ে বললেন, হাঁ মহারাজ, রামপ্রসাদ সেন নামে আপনার একজন প্রজা এই গাঁয়ে বসবাস করেন। কিন্তু, খাজনা পত্র কিছুই দেয় না। কেবল—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগত ভৃত্য বলতে বলতে হঠাৎ কথার মাঝে থেমে যেতেই, মহারাজা স-প্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকালেন সেই অনুগত ভৃত্যের মুখের দিকে। ভাবটা যেন 'কেবলটা' কি ?

মহারাজা এই রামপ্রসাদ সেন, কেবল মাত্র মায়ের নাম করে আপন মনে। বন-বাদরে ঘুরে-ফেরে, মা মা বলে আকুল হয়ে কাঁদে। কেউ শুনে বলে রামপ্রসাদ পাগল হয়ে গেছে, কেউবা বলে পাগল না হাতি। ভণ্ডামির আর কত কি দেখব।

অনুগত ভৃত্যের কথা শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন, এই রামপ্রসাদ কোথায় থাকে তুমি জান?

—হাঁ মহারাজ।

—বেশ। তুমি তাঁকে স-সম্মানে আমার দরবারে নিয়ে এসো। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশ করলেন তাঁর অনুগত ভৃত্যকে।

যে আজ্ঞে বলে, সেই ভৃত্য রামপ্রসাদকে স-সম্মানে নিয়ে আসবার জন্য প্রস্থান করলো।

॥ ১৪ ॥

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে, তাঁর অনুগত ভৃত্য রামপ্রসাদকে আনবার জন্য প্রস্থান করলে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভাববার চেষ্টা করেন রামপ্রসাদের কথা। কিন্তু, তাঁর সকল ভাবনা-চিন্তাকে ব্যাহত করে দিয়ে এই হালিশহর গাঁয়ের ও কুমারহট্টের অন্যান্য প্রজাবৃন্দরা এসে তাঁকে দর্শন করে যায়। নজরানা দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে; আবার তাঁদের মধ্যে যাঁরা দীন-দুঃখী অর্থাৎ দারিদ্রের চাপে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে, তারা শুধু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পদবন্দনা করে, তাদের অভাব-অনটন আর দুঃখ-দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশা করে।

ন্যায়বিদ্-বেদজ্ঞ, ভাগবদাচার্য পণ্ডিত প্রবরেরা তাঁদের পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্য, স্বস্তি বচন আওড়িয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা জানিয়ে আশীর্বাদ জানান। কিন্তু তাঁদের এত

হলো না। যদিও বা পণ্ডিত প্রবরদের স্বস্তি বচনে ও দীর্ঘায়ু কামনায়, তাঁদের সকলকে সমান দেখালেও শুধু তাঁর মনের মধ্যে এক মাত্র ভাবনা হয়ে দাঁড়াল সেই মা-পাগল,—মা-অন্তপ্রাণ রামপ্রসাদের কথাই।

কে?—কে এই রামপ্রসাদ? কি বা তাঁর পরিচয়? কিন্তু তাঁর অনুরক্ত ভৃত্যরাই বলে, মহারাজ! এই রামপ্রসাদ আপনার জমিদারীর একজন সামান্য প্রজা। আপনার খাজনাপত্র কিছুই দেয় না। শুধু পাগলের মতন মা মা করে চীৎকার করে, আর আপন মনে মায়ের নাম গান করে বেড়ায়।

কথাগুলি নিজের মনে ভাবতে গিয়ে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনের মধ্যে একটুখানি হাসির ঝিলিক দিয়ে যায়। আর তারই সাথে সাথে তাঁর মন যেন বার বার বলে ওঠে। এই বিশ্ব সংসারে কে কার প্রজা? হাসি পায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের।

হাসি পায় এই জন্য যে, যে জগন্মাতার খাশ তালুকের প্রজা হয়ে রয়েছে, তাঁকে আবার কে প্রজা করতে পারে? আর জগন্মাতার এই খাস তালুকের প্রজাকে যে বা যারা পাগল বলে উপহাস করে, তাদের মতন মায়ান্ধ সংসারের পাগল আর কটা আছে? কেননা এই বিশ্ব সংসারটাই একটা পাগলের হাট! আর এই সব পাগলের হিসেবই বা ক'জন রাখে?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনের মধ্যে একটা 'কিন্তু' এসে বার বার মনটাকে যেন ব্যস্ত করে তোলে। তাই তাঁকে আবার নূতন করে ভাবতে হয়। যাঁকে আনবার জন্য তাঁর অনুগত ভৃত্যকে পাঠানো হয়েছে, সে কি তাঁকে সঙ্গে করে আনতে পারবে? না, তাঁর মাতৃনামে আত্মসমাহিত ভাব দেখে ফিরে আসবে? যদিও বা ফিরে আসে, তবে তাকে আবার পাঠাতে হবে তাঁর কাছে আত্মসমাধি ভাব ভঙ্গ হলে আমার আদেশ জানিয়ে নিয়ে আসার জন্য।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যখন এমনি নানা ভাবনায় বিভোর হয়ে

উঠছিলেন, ঠিক তেমনি সময়ে তাঁর সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে ব্যহত করে দিল রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর। আর তখনই তাঁর সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শুনতে পেলেন, দূরে কোন এক অজানা স্বপ্নালোকের মধ্যে যেন রামপ্রসাদ গাইছেন। কখনো অভিমান আর দুঃখ বেদনা নিয়ে, আবার কখনো বা কৌতুক ভরে। আবার কখনো বা আনন্দে—

"তাই কাল রূপ ভালবাসি।
শ্যামা জগমন্মোহিনী এলোকেশী॥
কালোর গুণ ভালো জানে শুক শম্ভু দেব-ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব কালো রূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥
কালো বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন-উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী॥
প্রসাদ ভণে, অভেদ-জ্ঞানে কালো রূপে মেশামেশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন ক'রোনাক দ্বেষা-দ্বেষি॥"

রামপ্রসাদের কণ্ঠে আবেগ ভরা মাতৃনাম গানে যেন আকাশ বাতাস স্তব্ধ হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে যান মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এবং স্তব্ধ হয়ে নিজের মনে ভাববার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর সমস্ত ভাবনাকে ছাপিয়ে বার বার গুঞ্জন তোলে রামপ্রসাদের কণ্ঠের মাতৃনাম গানের দু'টি ছত্র। "তাই কালো রূপ ভালবাসি,—শ্যামা জগমন্মোহিনী এলোকেশী।"

নিষ্কাম না হলে, আত্মশুদ্ধি না হলে, কেউ কি এমন করে মাতৃনাম গান করতে পারে? পার্থিব সংসারে যাঁরা বসবাস করেন; ভোগ-বাসনায় যাঁদের মন চিরদিন আবদ্ধ থাকে;—তাঁরা কখনো কোন সময়ে আশক্তিবিহীন হয়ে মায়ের অপরূপ রূপ মাধুরী বর্ণনা করতে পারে না।

সাধক মহাজনেরাই ত বলেছেন—আশক্তি থাকলে ভোগ বাসনা

আসবে। আর ভোগ-বাসনা এলেই মন কামাচারের দিকে যাবে আর তখন এই পার্থিব সংসারের জীব কীটানুকীট হয়ে যাবে। এবং যাঁরা সংসারের মায়া বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ও আশক্তিবিহীন শুদ্ধ 'প্রেম' দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন তাঁরা ধীরে ধীরে এই মায়ার সংসার থেকে, এই মায়ার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারেন।

রামপ্রসাদ সংসারের মায়া বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও, কেবল মাত্র নিজের মনকে মুক্ত রেখে, একমাত্র মুক্তকেশীর নাম গানে নিজেই সমাহিত হয়ে রয়েছেন। আর সেই মুক্ত পুরুষের উদ্দেশ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মনে মনে প্রণাম না জানিয়ে স্থির থাকতে পারলেন না।

নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন, সেই আশক্তিবিহীন মুক্ত পুরুষের দর্শন লাভের আশায়।

॥ ১৫ ॥

তখন প্রভাতী সূর্যের উজ্জ্বল দ্যুতি পূর্বাশার দিগ চক্রবালে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। থেমে গেছে প্রভাতী বিহগের কলকূজন। জেগে উঠেছে সমস্ত জগৎজুড়ে একটা শ্যাম সঙ্গীতের এক মনমোহনীয়া সুর লহরী। যেন, সেই লহরী আদি থেকে অনাদিতে, এবং অনাদি থেকে অনন্তের মাঝে প্রতিধ্বনি তুলে আবার ফিরে আসে অনাদিতে। অনাদি থেকে আদিতে। তারপর আবার আদি থেকে অনাদি অনন্তের মাঝে ঘুরে চলে। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ঙ্করীর প্রলয় রূপ হতে রূপান্তে বিলীন হয়ে গিয়ে পরম ব্রহ্মের মাঝে অঙ্গিভূত হয়ে গিয়েছে। এমনি এক শুভ মুহূর্তে রামপ্রসাদ মাতৃমান গানে সমাহিত হয়ে রয়েছেন। ঠিক তেমনি সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগত ভৃত্য এসে দাঁড়াল রামপ্রসাদের সামনে। রামপ্রসাদকে আত্মগত আত্ম সমাহিত ভাবে উপবিষ্ট হয়ে থাকতে দেখে তাঁর আত্মসমাহিত ভাবটিকে ভঙ্গ করতে সাহসী হল না। কারণ, তাঁর এই আত্মসমাহিত

ভাবটি ভঙ্গ করে মহারাজের আর্জি পেশ করতে গেলে, হয়তো মহামায়ার ক্রোভে পড়তে পারে। তার থেকে বরঞ্চ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা অনেক শ্রেয়। নিজের মনে কথাগুলি ভেবে নিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগত ভৃত্যটি। এবং ভেবে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আর নিজের মনে নানা কথা ভাবতে লাগল।

যখন মহারাজের অনুগত ভৃত্যটি এমনি নানা ভাবনা ভাবতে ছিল, ঠিক তেমনি সময়, রামপ্রসাদ আত্মসমাহিত ভাবে গেয়ে উঠলেন। গেযে উঠলেন যেন বিশ্বনিয়ন্তা জগন্মাতার অনুরোধে, তাঁরই আত্মভোলা সন্তান, আত্মসমাহিত ভাবেই গেযে উঠলেন—

"এবার কালী কুলাইব।
কালী কোষে কালী বুঝে লব।
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাগু করি, হৃদিপদ্মে নাচাইব॥
কালীপদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব॥
কালী ভেবে কালি হ'য়ে, কালী ব'লে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে কালি দিয়ে চলে যাব॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি, তবু কালী ঝুলি না ছাড়িব॥"

মাতৃনাম গানে রামপ্রসাদ আত্মহারা হয়ে পড়েন। আর তাঁর এই মাতৃনাম গানের আনন্দের একটা অমৃতময় ধারা যেন এই বিশ্ব-সংসারের মাঝে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত পাপ গ্লানিকে ভাসিয়ে দিয়ে; সকলকে যেন অমৃতঃস্য পুত্রা রূপে সৃষ্টি করতে চান!

রামপ্রসাদ যখন এমনি মাতৃনাম গানে আত্মহারা হয়ে রইলেন, সেই সময় স্তব্ধ-বিস্ময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগত ভৃত্যটি সেই মাতৃনাম গান শুনতে শুনতে ভাবছিলেন, ঠাকুর রামপ্রসাদকে কি ভাবে কেমন করে মহারাজের আদেশ জানাবে! তা ছাড়া এই সময়ে মহারাজের আদেশ জানানো সহজ সাধ্যও নয়। তা হলে

উপায়? একমাত্র উপায় সাধক রামপ্রসাদের সমাধি ভঙ্গ না হওয়ায় পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

এমনি যখন ভাবতে থাকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভৃত্য, তখন রামপ্রসাদের আত্মসমাহিত ভাব বিদূরীত হয়ে যায়। তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে সামনের দিকে তাকালেন। এবং তাকাতেই মহারাজের অনুগত ভৃত্যের দিকে নজর পড়তেই তিনি বিস্মিত হয়ে যান। বিস্ময় ভরা কণ্ঠে শুধালেন, কে? কে আপনি? আর এখানেই বা কেন এসেছেন? রামপ্রসাদের প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভৃত্যটি কৃতাঞ্জলি পুটে বললেন—

ঠাকুর, আমি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভৃত্য। আমাকে আপনার কাছে তিনি পাঠিয়েছেন।

—কে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র? আমি তো তাঁকে চিন্‌তে পারছি না। শুধু তো জানি, একমাত্র যিনি বিশ্ব নিয়ন্তা তাঁকেই। শুধু জানি রাজার রাজা মহারাজা বলে, তাঁর উপর আর দ্বিতীয় কোন রাজা আছে বলে আমার জানা নেই!

—সে কি ঠাকুর? কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আপনি চিন্‌তে পারলেন না! চিন্‌তে পারলেন না আপনি তাঁকে? তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে এই ক্ষুদ্র গাঁ হালিশহর যার একটি অংশ, আর যাঁর দয়ায় আপনি আর আপনার মত অন্যান্যরা পরম শান্তিতে এই হালিশহর গাঁয়ে বসবাস করছেন; সেই দয়ার অবতার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আপনি চিন্‌তে পারছেন না ঠাকুর। আশ্চর্য!

পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন আত্মভোলা সদানন্দময় রামপ্রসাদ। তারপর প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন, তা বটে! আমারই যে চেনার ভুল হয়ে যাচ্ছে। অনন্ত বিশ্ব সংসারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই যে 'কৃষ্ণ' অবতার হয়ে এসেছেন তা' আমার আগেই বোঝা উচিৎ ছিল। তা, এই বিশ্ব সংসারে কেউবা রাজা, আর কেউবা প্রজা। রাজার আদেশ প্রজাকেই ত মানতে হবে। বলেই রামপ্রসাদ প্রশান্ত হাসি হাসলেন। এবং উদার উদাস কণ্ঠে গাইতে লাগলেন মাতৃনাম গান।

"হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা।
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো পুর হতে দূর করে দি॥
বিমাতা মরেন শোকেতে, ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা হাজির ফরিয়াদী বাদী:
এই স্বোপার্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা তোমার পুতে সতীন-সুতে, জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভনে ভরসা মনে বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥"

রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে একটা উজ্জ্বল দ্যুতিতে পরিপূর্ণ করে তুলল আর তারই সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগত ভৃত্য রামপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

॥ ১৬ ॥

রামপ্রসাদ এলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নব নির্মিত রাজসভায়।

রাজসভায় এসেই রামপ্রসাদ আত্মসমাহিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন, ধরার মাঝে সমস্ত পঙ্কিলতাকে ছাপিয়ে দিয়ে একটা জ্যোতির্ময় দীপ শিখার মতন এসে। আর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র?

সেই অনির্বাণ দীপ শিখাটির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এই দীন ভিখারীর মতন লোকটিই রামপ্রসাদ? যাঁর কণ্ঠের মাতৃনাম গানে হালিশহর আর কুমার হট্ট এবং সমস্ত গ্রাম বাসীদের মনের মধ্যে একটা অজানিত ভক্তি রসে আপ্লুত করে তুলে। এমন কি আমার মনকেও পর্যন্ত।

ভাবলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবলেন, রামপ্রসাদ সামান্য দীন ভিখারী বেসে এলেও, রাজরাজেশ্বর! রাজ-রাজ্য এঁর কাছে তুচ্ছ। অর্থ কামাদি সব কিছুই তুচ্ছ!

কথাগুলি ভাবতে গিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনের মধ্যে একটা অজানিত আনন্দের স্রোত বইতে থাকে! তবুও নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত করে নিয়ে প্রশান্ত অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন কে তুমি? কি চাই তোমার?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই জিজ্ঞাসায়, প্রশান্ত স্বরে রামপ্রসাদ বললেন মহারাজের রাজদরবারে এই দীনের চাইবার মতন কিছুই নেই মহারাজ! তবে এই দীন ভিখারীকে কেন স্মরণ করেছেন তা' যদি—

বাধা দিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তেমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন, তোমার সে কথা কে শুনতে চাইছে? শুধু তোমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছি, তুমি কে? কি তোমার নাম?

হাসলেন রামপ্রসাদ। প্রশান্ত হাসি হাসলেন। তারপর তেমনি প্রশান্ত হাসি মুখে বললেন মহাবাজ, এই দীনের নাম রামপ্রসাদ সেনঃ। নিবাস এই হালিশহরের কুমার হট্ট গাঁয়ে।

—কি? কি নাম বললে? রামপ্রসাদ সেন? কিন্তু, তোমার নামে অনেক নালিশ রয়েছে আমার কাছে! বলেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটুখানি নীরব থেকে পুনশ্চ বলতে লাগলেন আমার গোমস্তা আর অনুচরেরা তোমার নামে অনুযোগ করেছে; তুমি নাকি আমার অনেক বছরের 'খাজনা' বাকী ফেলে রেখেছ, তার কারণ কি জানতে পারি? মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন!

—মহারাজ, এই বিশ্বসংসারে কার না খাজনা বাকী থাকে? স্বয়ং মহারাজের যে খাজনা বাকী পড়ে রয়েছে তা' কি মহারাজ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে পেরেছেন?

—সে কি কথা বলছ রামপ্রসাদ? আমার আবার খাজনা বাকী পড়ে রইল কোথায়? গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন। তারপর একটুখানি নীরব থেকে, পুনশ্চ বলতে লাগলেন, আমি হলেম

এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা। আর রাজা হয়ে আবার খাজনা বাকী থাকে মানে কি রামপ্রসাদ? এবং কার কাছেই বা আমার খাজনা বাকী পড়ে থাকবে? বলেই তিনি রামপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে রামপ্রসাদ হাসলেন। হাসলেন প্রশান্ত হাসি। তারপর তেমনি প্রশান্ত হাসি মুখে বললেন, কেন মহারাজা? জগন্মাতা শ্যামা মায়ের দরবারে কার না খাজনা বাকী পড়ে থাকে? যিনি বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা হন, রাজ্য শাসন করেন তাঁর তো খাজনা বাকী পড়ে থাকে শ্যামা মায়ের দরবারে। আর যে প্রজা হয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিবাসী হয়ে বাস করছে তারও যে খাজনা বাকী পড়ে থাকে। মহারাজা এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। প্রশান্ত হাসি মুখে কথা কয়টি বলে, তেমনি হাসি মুখে গাইলেন—

"হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা॥
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো পুর হতে দূর করে দি॥
বিমাতা মরেন শোকেতে, ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা তোমার পুতে সতীন-সুতে, জোর করে কার কাছে কাঁদি।
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥"

রামপ্রসাদের কণ্ঠে মাতৃনাম গানের সুর মাধুর্যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা যেন গম্ গম্ করতে থাকে। একটা বিস্ময়

আর স্তব্ধতা এসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে একেবারে নির্বাক করে দেয়। স্তব্ধ করে দেয় সমস্ত রাজসভাকে।

যেন কোন এক বিখ্যাত যাদুকর এসে, একটা বিরাট বিস্ময়ের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। আর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ? বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকেন রামপ্রসাদের মুখের দিকে। "যিনি জগন্মাতার দরবারে 'ফরিয়াদ বাদী' হয়ে রয়েছেন তাঁর সঙ্গে কোন প্রকার চালাকি প্রকাশ করতে যাওয়া মানেই নিজের সঙ্গেই নিজেকে চালাকি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন এমনি নানা কথা ভাবতে থাকেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তেমনি সময়ে রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে প্রশান্ত স্বরে বললেন, মহারাজ জগৎ মাতার দরবারে কেন না, ফরিয়াদী বাদী নেই ? স্বয়ং মহারাজাও খাজনার দায়ে 'বাদী' হয়ে রয়েছেন জগৎমাতার দরবারে। আর আমরা তো কোন ছাড়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কথা শুনে গম্ভীর স্বরে বললেন, ঠিকই বলেছ রামপ্রসাদ। তোমার মত 'মাতৃভক্ত' সন্তানের কাছ থেকে এমন কথাই আশা করেছি। তাছাড়া তুমি যে কত বড় 'মাতৃভক্ত সাধক' তা আমার বুঝতে এতটুকু দেরী হয়নি। তুমি যে রাজার রাজা হয়ে, বিশ্বনিয়ন্তা 'জগন্মাতার পাতা' আসনেই তোমার স্থান করে নিয়েছ। আর আমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা হয়েও দীন ভিখারী। আর সত্যিই জগৎমাতার দরবারে আমি 'ফরিয়াদী বাদী'!

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে, রামপ্রসাদ প্রশান্ত স্বরে বললেন, আপনি নিজেকে নিজেই চিন্‌তে পেরেছেন, তা একমাত্র আমার করুণাময়ী 'শ্যামা' মায়ের কৃপা বলেই। আজ যদি সারা পৃথিবীর মধ্যে যত রাজ্য আছে, সেই সব রাজ্যের রাজন্যবর্গরা যদি আপনার মতন নিজেরা নিজেকে চিনতে পারতেন, তা'হলে এই বিশ্ব সংসারে এমন অনাসৃষ্টি হত না। আর রাজায় প্রজায় এমন দ্বন্দ্বও ঘটতো না।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন,

তুমি ঠিক কথাই বলেছ রামপ্রসাদ। আমরা সকলেই 'মহামায়ার' মহাশক্তির ক্রীড়নক্ ভিন্ন অন্য কিছু নই। আমরা যদি তাঁর সমস্ত খেলা বুঝতে পারতাম তা হলে এমন বিপত্তি এই বিশ্ব সংসারে ঘটতো কিনা সন্দেহ।

—তা ঠিক মহারাজ। আমার মা 'তারা শক্তির' এমন মায়ার খেলা আছে যে, সামান্য মানুষ ত দূরের কথা, অনেক যোগী তপস্বীরাও হার স্বীকার করেন। তাঁরা যোগ ভ্রষ্ট হয়ে সংসারের মায়া বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। তা'ছাড়া আমার শ্যামা মায়ের কাছে যে যেমনটি চায়, সে তেমনটি পায়, মহারাজ। সে যে যেমন তেমন 'মেয়ে' নয়। বলেই রামপ্রসাদ, গেয়ে উঠলেন—

"সে কি এম্নি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষ হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লুটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥"

মাতৃনাম গান করতে করতে রামপ্রসাদ কেমন যেন ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও যেন কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়েন তিনি ভাববার চেষ্টা করেন; এমন এক মাতৃভক্ত সাধকের নামে লোকে কথা বলে। তারা কি এমন লোককে চিন্‌তে পারল না? আশ্চর্য!

ভাবেন, তাঁর রাজসভায় যারা এই রামপ্রসাদের নামে. খাজনা বাকীর অভিযোগ করেছে, তারা কি এক লহমার জন্য এই সাধককে চেনবার চেষ্টা করল না?

কথাগুলি ভাবতে গিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন একটা অজানিত গাম্ভীর্য এসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর এই

গাম্ভীর্য ভাব দর্শন করে যারা রামপ্রসাদের নামে অভিযোগ করেছিল, তারা যেন ভয়ে কেমন জড়-সড় হয়ে গেল।—না জানি কি অঘটন ঘটে যায় এই ভয়ে।

কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কাউকেও কোন কথা না বলে তেমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবে নীরব হয়ে রইলেন।

এমনি এক নীরবতার ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ কেটে যায়। তারপরে একসময় রামপ্রসাদ সেই ভাবাবিষ্ট থেকে ফিরে এসেই প্রশান্ত দৃষ্টি তুলে তাকালেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখের দিকে। প্রশান্তস্বরে বললেন —মহারাজা, আমার শ্যামা মা এম্নি এক মেয়ে। যার একটি কটাক্ষে, নিমেষের মধ্যে একটা প্রলয় সৃষ্টি করে; সৃষ্টি-স্থিতিকে লয় করে দিতে পারেন। আবার যদি ইচ্ছা করেন, তা নূতন করে গড়ে তুলতে তাঁর এতটুকু বিলম্ব হয় না।

রামপ্রসাদের কথা শুনে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, তা' ঠিক কথাই রামপ্রসাদ। মহামায়া মহাশক্তি না পারেন এমন কর্মই নাই। শুধু তাঁর ইঙ্গিতে আমরা কেবল নিমিত্তমাত্র হয়ে চলি।—তাই ত বলি, সার্থক তোমার জীবন মন! আর সার্থক তোমার মাতৃভক্তি! কেন না তুমি একজন ভক্ত কবি, তুমিই আবার গায়ক কিন্তু তোমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়—তুমি একজন মহান 'সাধক কবি'।—বলেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষণিকের জন্য নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন, রামপ্রসাদ! তোমার গাঁয়ের লোকেরা—যারা তোমায় চিনতে না পেরে, তোমার নামে নানা অভিযোগ করেছে শুধু আমার অনুরোধ, তাদের তুমি ক্ষমা করো। এবং তোমার 'বকেয়া' খাজনার যে অভিযোগ আমার দরবারে উঠেছে তা' আমি সম্পূর্ণ মকুব করে দিলাম। বলেই তিনি পুনশ্চ কিছু সময়ের জন্য নীরব থেকে আবার বললেন —আর তোমার বসত বাটীটি, তোমার বংশধরেরা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন নিষ্কর ভাবে ভোগ-দখল করতে পারবে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শেষ হতেই, রামপ্রসাদ সহাস্তে

বললেন,—মহারাজের দয়ার সীমা নেই। কিন্তু মহারাজ, এর কোনটারই আমার প্রয়োজন নেই। শুধু আমার একমাত্র কামনা, মরণকালে যেন 'তারা' নামে, 'মরণ সাগরে' ডুব দিতে পারি, এ শুধু জগন্মাতার কাছে আমার প্রার্থনা!—আপনার এই দান আপনি ফিরিয়ে নিন মহারাজ! এইসব ভোগ-বাসনার ধন আমার কোন প্রয়োজন নেই।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কথা শুনে বললেন, না রামপ্রসাদ না। তোমায় দান করবার মতন আমার কোন শক্তিই নেই। আর এতবড় দুঃখসাহস আমিও করি না। শুধুমাত্র তোমার সাধনায় কেউ যাতে ব্যাঘাৎ ঘটাতে না পারে তারই একটা ব্যবস্থা করে দিলাম; একমাত্র 'তারা শক্তির' ইচ্ছা অনুসারে। এবং তাঁরই সেবার জন্যই বটে।

তাঁর কথা শুনে, রামপ্রসাদ এর পর আর দ্বিতীয় কথাটি বলতে পারলেন না।—শুধু নীরবে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন; 'না জানি মহামায়া মহাশক্তি আমার তারা মায়ের একি লীলাখেলা! না, মায়া আর মোহবন্ধনে বন্দী করতে চান!' বলেই তিনি পুনশ্চ ক্ষণকালের জন্য নীরব হয়ে গেলেন। তারপর, ক্ষণকাল এমনি নীরব থেকে, অবশেষে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে, মহারাজের কাছ থেকে বিদায় প্রার্থনা করলেন।

রামপ্রসাদকে বিদায় প্রার্থনা করতে দেখে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ধীর অথচ তেমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন;—হাঁ রামপ্রসাদ! তোমাকে আর বেশী কষ্ট দেবো না।—তবে, তুমি চলে যাবার পূর্বে তোমায় একটা অনুরোধ করবো।—তা রাখবে?

"আদেশ করুন মহারাজ! ধীর অথচ তেমনি প্রশান্তপূর্ণ স্বরে।

রামপ্রসাদ বললেন, 'যদি সাধ্যাতীত না হয়, তবে তা রাখবার চেষ্টা করবো।"

'আমার অনুরোধ এমন বিশেষ কিছু নয়। আগামীকল্যই আমার স্ব-রাজ্য 'কৃষ্ণনগরে' চলে যাচ্ছি। যদি পার বা সম্ভব হয়, কৃষ্ণনগরে

গিয়ে মাতৃনাম গান শুনিয়ে আস, তবে বড়ই সুখী হব! শুধু যে কাছে আমার এই অনুরোধ। কেমন এক বিনীত আর করুণ স্বর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে প্রকাশ পায়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ শুনে, রামপ্রসাদ ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পরে বললেন—মহারাজাকে এখন কথা দিতে পারলাম না বলে অপরাধ মার্জনা করবেন।—তবে মহামায়া মহাশক্তি আমার শ্যামা মা যদি একান্ত ইচ্ছা করেন, তবে তাই হবে!

তোমার এ কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট রামপ্রসাদ! শ্যামা মায়ের যদি ইচ্ছা হয়, এবং তাঁর এই অভাগা সন্তানের প্রতি দয়া করেন;—তবে একবার কৃষ্ণনগরে যেতে ভুল করোনা রামপ্রসাদ। বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

'তাই হবে মহারাজ! মহামায়া মহাশক্তি তারা মায়ের ইচ্ছা হলে আপনার বাসনা অপূরণ থাকবে না। বিনীত ভাবে রামপ্রসাদ বললেন। তারপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন, স্বীয় সাধন পীঠের উদ্দেশ্যে।

॥ ১৭ ॥

এই ঘটনা ঘটে যাবার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যায়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহামায়া মহাশক্তির আদি লীলাভূমি, পুণ্যতীর্থ হালিশহর গ্রাম পরিত্যাগ করে যে দিন স্বপ্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য কৃষ্ণনগরে ফিরে এলেন, সেই দিন থেকেই তাঁর সমস্ত মনটা যেন একটা কিসের দুর্নিবার আকর্ষণে বার বার উন্মনা হয়ে উঠতে থাকে। আর সেই দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে নিজের মনকে কোন মতে মুক্ত করতে পারলেন না। এই ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে নিজের মনকে মুক্ত করতে না পারার জন্যই, তাঁর রাজকার্য পরিচালনার দিক দিয়েও একটা শিথিলতা পরিলক্ষিত হতে লাগল।

রাজসভায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই অনাশক্ত ভাব লক্ষ্য করে,

সভাসদ অমাত্যরা সকলেই যেন বেশ চিন্তিত হয়ে ওঠেন। তা'ছাড়া তাঁরা সকলেই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছেন না,—হালিশহর গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর থেকেই মহারাজা কেন এমন উন্মনা হয়ে উঠেছেন। সাহস করে কেহ কোন দিন কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হলেন না। তা'ছাড়া মহারাজ স্ব-ইচ্ছায় কোন কথা ব্যক্ত না করলে, এর প্রতিবিধান করতে পারবেন না সভাসদ মাত্য-অমাত্যরা। এখন শুধু একমাত্র অপেক্ষা করা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথই দেখতে পেলেন না।

তাই তাঁরা তারই জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু, তাদের বেশী দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হলো না। কারণ একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সভায় চিন্তাকুল ভাবে রাজ কার্য পরিচালনা করছিলেন, তা'দেখে তাঁরই সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বললেন, মহারাজ! বিদেশ থেকে ভ্রমণ করে আসার পর থেকেই যেন বড়ই উন্মনা হয়ে পরেছেন। তার হেতুটা কি জানতে পারি?—

বলেই 'রায়গুণাকর' পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন মহারাজের মুখের দিকে।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে তাঁর মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকাতে দেখে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, হ্যাঁ কবি, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমার মনটা যেন বার বার উন্মনা হয়ে উঠছে। কিন্তু—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কথা শেষ না করে, নীরব হয়ে রইলেন। এবং তাঁকে নীবর হয়ে যেতে দেখে 'রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র পুনশ্চ বললেন, হঠাৎ মহারাজের মন এমন উন্মনা হয়ে ওঠার কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

রায়গুণাকরের এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পূর্বের মতন নীরবেই ভাবতে লাগলেন। আর তাঁর এই নীরবতাকে লক্ষ্য করে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র আর দ্বিতীয় কোন কথা বলতে সাহসী হলেন না।

তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা অবশ্যক বলে মনে করি, তা এখানে বলে রাখি—

প্রাচীন ইতিহাসকে নিয়ে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, মোগল যুগে, মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে, তাঁর রাজ সভায় নয় জন 'রত্ন' ছিল। এই নয়জন রত্নের মধ্যে বীরবল, টৌডরমল, তানসেন প্রভৃতি রত্নরা এক এক জন বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। তেমনি আকবরশাহের রাজত্ব কালের বহু বছর পরে হিন্দু রাজার রাজত্ব কালে, অর্থাৎ লক্ষণ সেনের রাজত্ব কালেও আমরা এই নবরত্নের উল্লেখ দেখতে পাই। আর লক্ষণ সেনের এই নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্নহিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন, বাংলার কবি 'জয়দেব'।

যাঁর গীতকাব্য, 'গীত গোবিন্দের' সুরলিত ছন্দে, আর প্রেম-ভক্তি-রসে আপ্লুত হয়ে, স্বয়ং ভগবানের আসন পর্যন্ত প্রকম্পিত করে তুলেছিলেন।* তেমনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরও রাজসভাতে এই নবরত্নের সৃষ্টি করেছিলেন। আর, তাঁর এই নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্নহিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। আর হাস্য রসিক 'গোপাল ভাঁড়কেও আর এক শ্রেষ্ঠ রত্ন হিসাবে অবিহিত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্ব কালের এই সব নবরত্নের নানা পরিচয় আমরা পাই।

রায়গুণকর ভারতচন্দ্র, প্রথমে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাতে সামান্য এক গ্রাম্য কবি হিসাবে স্থান পান। এবং পরবর্তীকালে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে,—'অন্নদামঙ্গলে কাব্যগ্রন্থ' রচনা করেন।

* কবি জয়দেবের অমর কাব্য 'গীতগোবিন্দের' সুরলিত সঙ্গীত মাধুরীতে পরিতুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; এই 'গীতগোবিন্দের' গীতগুলির গায়কের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করে ফিরতেন। প্রবাদ আছে,—এক মালিনী জয়দেবের গীতগোবিন্দের' গীতগুলি গাইতে গাইতে বেগুন ক্ষেতে বেগুন তুলছিলেন; তখন শিখি পুচ্ছ ধরে নারায়ণ মধুর মুরলীর মধুর সুতান তুলে, বেগুন ক্ষেতের মধ্যে মালিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করেছিলেন।

এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে, তাঁর থেকে 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করেন। আর—

সেই থেকে তাঁর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়। কিন্তু, আলোচ্য বিষয় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবন ও কবিত্বকে নিয়ে নয়। কারণ প্রয়োজন বোধে এখানে রায়গুণাকরের নাম ও কাব্যের কথা উল্লেখ করতে হয়েছে। কেন না; যাঁর পূত জীবনখ্যানের কথা আমরা বলতে বসেছি, সেই সাধক কবি রামপ্রসাদ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সঙ্গে কিছুটা সংশ্রব আছে বলেই, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। এবং সময় সাপেক্ষে সাধক কবি রামপ্রসাদ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর রায়গুণাকরের যে মিলন ঘটবে তা পূর্বেই এখানে বলে রাখছি অতএব—

এখন যা বলতে বসেছি তাই বলি।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বার বার উন্মনা হয়ে যেতে দেখে রাজ সভায় অমাত্যরা কেমন যেন বিমনা হয়ে পরেন। অথচ তাঁরা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছেন না যে, এর মূল কোথায়? কিন্তু, রাজা অমাত্যরা সকলেই বিমনা হয়ে ভাববার কিংবা এর মূল খোঁজ করবার চেষ্টা করলেও; রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র মনের মধ্যে একটা কৌতূহল যেন অনুভব করতে থাকেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন, 'নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য লুকায়িত আছে; যা মহারাজ স্বয়ং তা প্রকাশ করছেন না। এবং যেমন করেই হোক রহস্যটা কি জানতে হবে।" কথাগুলি নিজের মনে ভেবে নিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বার বার অনুরোধ জানাতে থাকেন; এবং চেষ্টা করেন, এমন উন্মনা হয়ে থাকার হেতু কি থাকতে পারে!

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বার বার এমনি ধারা অনুরোধকে এড়াতে না পেরে, একসময় গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে প্রশান্ত স্বরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন; না রায়গুণাকর, রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কোন আশংকার জন্য আমার মানসিক কোনরূপ চিন্তার কারণ হয়নি।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মনে কৌতূহল যেন আরো শতগুণ বেড়ে যায়। তাই তিনি সে কৌতূহলকে দমন করতে না পেরে তেমনি রহস্যভরা স্বরে বললেন; রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আশংকা নেই জেনেও এমন উন্মনা হয়ে থাকার কারণটাই বুঝতে পারছি না, যদি—

হাঁ রায়গুণাকর! তুমি ভাবছ আমি কোন জটিল সমস্যা নিয়ে ভাবছি, তাই আমার মনকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর একটু সময় নীরব থেকে পুনশ্চ বলতে লাগলেন, কিন্তু, আসলে তা নয় রায়গুণাকর। আমি ভাবছি অন্য কথা।

—কিন্তু, মহারাজ সে কথাটাই বা কি?

প্রশান্ত হাসি হাসলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

হেসেই তেমনি প্রশান্ত স্বরে বললেন; তোমার কৌতূহলটাই আসলে সেখানে—তাই নয় কি রায়গুণাকর?

—বিচক্ষণ মহারাজার কাছে কোন কিছু অবিদিত থাকে না। কিন্তু মহারাজ যদি কৃপা করে রহস্যের সমাধান করে দেন, তা'হলে আমাদের ভাবনার কিছু থাকে না, কিন্তু, সে অমূল্য রত্নের সন্ধান কোথায় পেলেন মহারাজ?

—এবার হালিশহরে গিয়েই সেই অমূল্য রত্নের সন্ধান পেয়েছি, রায়গুণাকর।—সে এমন রত্ন যে সারা বাংলা দেশে খুঁজলে বোধ হয় দু'জন মিলবে কিনা; আমার সন্দেহ হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সহাস্যে বললেন,—তাই না কি মহারাজ! কিন্তু,—কি এমন সে রত্ন?

—সে কি এমন রত্ন? হাসলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র? রায়গুণাকর, সে তোমারই মতন 'ভক্ত কবি রত্ন। ভক্তি-প্রেমের মাধুর্য দিয়ে, এবং সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমে, স্বীয়-জীবন-মনকে আহুতি দিয়েছেন; বিশ্বনিয়ন্তা মহামায়া মহাশক্তির পদতলে॥—রায়গুণাকর তাঁর মতন ভক্ত কবি মানব সংসারে মেলা বোধহয় দুষ্কর হয়ে উঠবে।—শুধু তা'

নয় রায়গুণাকর; এই সাধক কবির কণ্ঠে মাতৃনাম গানে সমস্ত হালিশহরের গাঁটিকে মাতিয়ে তুলেছে। একটা অজানিত ভাবাবেগে কথাগুলি ব্যক্ত করে গেলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। আর—

তাঁর কথা শুনে একটু যেন উপহাস্যের হাসি হেসে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বললেন—তাই নাকি মহারাজ? কিন্তু সেই সাধক কবির নামটি কি জান্‌তে পারি?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র,—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কথা শুনে মনে মনে একটু হাসলেন। তারপর প্রশান্ত স্বরে বললেন;—হঁ। কবি তাঁর নাম জানতে পার বৈকি।—কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই প্রথমে তাঁর নামটি উহ্য রেখেছিলাম। কারণ; তাঁর নাম শুন্‌লে 'ঈর্ষা' জাগতে পারে এই জন্য। কিন্তু দেখ রায়গুণাকর তুমিও মনে মনে 'ঈর্ষা' প্রকাশ করে বোস না যেন। বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

—'ঈর্ষা'! 'ঈর্ষা' করবার কি থাকতে পারে মহারাজ! একটু যেন ব্যঙ্গ স্বরে বললেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র!

'ঈর্ষা' করবার মতন আছে বইকি কবি!—এই বিশ্ব সংসারে কে কাকে কখন যে ঈর্ষা করে তার কোন হিসেব-নিকেশ আছে। বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এবং বলেই একটুখানি নীরব থেকে আবার বললেন—কিন্তু যাক সে সব কথা। এবার হালিশহরে গিয়ে যাঁর সাক্ষাৎ পেলাম, এবং যাঁর কথা ভাবতে গিয়ে আমার মন বার বার উন্মনা হয়ে ওঠে তারই নাম সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। আমারই এক সামান্য প্রজা।—অথচ নিঃস্বার্থ, নির্লোভ। আর তারই কণ্ঠে মাতৃনাম গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি কবি।

—তাই নাকি মহারাজ? যদি সেই মহাত্মা এমন প্রতিভাবান হন তবে তাঁকে মহারাজের স্ব-রাজধানী কৃষ্ণনগরে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন।—তা' ছাড়া আমাদের মতন 'ঈতরে জনা' সেই প্রতিভাবান মহাত্মাকে দর্শন করে এবং তাঁরই কণ্ঠে মাতৃনাম গান শুনে আমরাও ধন্য হতাম। একটু ব্যঙ্গ জড়িত স্বরে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বললেন। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রায়গুণাকর ভারত

চন্দ্রের এহেন ব্যঙ্গকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করে প্রশান্ত অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, তোমার বলার অপেক্ষা করিনি কবি। তোমার উপদেশ নেবার অনেক পূর্বেই মাতৃ-সাধক, জগন্মাতার একান্ত ভক্ত রামপ্রসাদকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি। এবং তাঁকে এই সাদর আমন্ত্রণ জানাবার একটা যে কারণও না ছিল এমন নয়। আর সেই কারণটা তোমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন আছে। তাই—বলেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য নীরব থেকে পুনশ্চ বলতে লাগলেন, হাঁ! সেই কারণটা হচ্ছে, রামপ্রসাদের মতন এমন এক মাতৃসাধক, আর মাতৃভক্ত সন্তান যদি আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যে একবার চরণ ধূলি দেয়, তা হলে আমার এই সম্পূর্ণ রাজ্যটা ধন্য হয়ে যাবে।

কথা কয়টি বলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কবি আমার কথা শুনে হয়তো তোমার মনে অভিমান আসতে পারে; সামান্য এক গ্রাম্য মাতৃ সাধকের সঙ্গে তোমার তুলনা করছি বলে। কিন্তু আসলে তা নয়, আমার আদেশে আর মহামায়া মহাশক্তি অন্নদায়িনী অন্নদার কৃপায় তুমি যেভাবে চরিতাখ্যান রচনা করেছ তা' তোমার সার্থক কাব্য সৃষ্টি তা'তে সন্দেহের কোন কারণ ঘটতে পারে না।—তোমার 'অন্নদামঙ্গল' সার্থক সৃষ্টি।

—সাধু! সাধু! মহারাজা আপনার সুতীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি দেখে আর সব দিকের সবকিছুকে বজায় রাখবার ক্ষমতা দেখে আপনাকে সাধুবাদ না জানিয়ে থাকতে পারলাম না, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বললেন। তারপর একটুখানি থেমে আবার বললেন, কিন্তু দেখবেন মহারাজ, এর জন্য যেন দীন কবির উপর অপরাধ নেবেন না।

—অপরাধ নেবার মতন হলে পূর্বেই নিতাম কবি। কিন্তু সংসারে যেটা সত্য বলে পরিচিত আর যেটা সরল সত্য বাস্তবতার রূপ নেয়, সেই বাস্তবতাকে সম্মান দেখাতে আর সাদর আমন্ত্রণ জানাতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন না। আর তাই কবি.

তোমার সাধুবাদ জ্ঞাপন করা কিংবা না করা একই পর্যায়ে পড়ল।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কথাগুলিকে কৌতুকচ্ছলে বললেও তার মধ্যে একটা দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাস দেখে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র দ্বিতীয় কোন কথা বলতে সাহসী হলেন না। কেননা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র একথা জানতেন যে, যে সৎ এবং সত্যবাদী আর সত্যই মহাজ্ঞানী গুণী, তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো আর তাঁকে সমাদর করা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাতে চিরদিন হয়ে আসছে।

আর নিজের অতীত জীবনের কথা ভাবতে গিয়েও আজ তাঁর মনের গোপন স্মৃতিগুলি একের পর এক স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে চোখের সামনেই ফুটে ওঠে। মনে পড়ে—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেশ ও সমাজ যাকে অবহেলিত এবং লাঞ্ছিত করে, স্বীয় জন্মভূমি থেকে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করে দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করলো না—সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত যুবকই একদিন পথের কাঙ্গাল হয়ে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

তারপর স্বীয় শ্বশুর মহাশয় কৃপা করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে হাজির করিয়ে, তাঁর কবি কৃতির কথা স্ববিস্তারে বর্ণনা করে, তাঁরই রাজদরবারে যাতে আশ্রয় লাভ করতে পারে, তার জন্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ জানালেন।

আর কৃষ্ণচন্দ্র তার কবিকৃতি ও প্রতিভার পরিচয়ের কথা শুনে তাকে আশ্রয় দান করলেন, নিজের রাজসভাতে। এবং তাঁর কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই তাকে চরম সম্মানের আসনে বসিয়ে ঘোষণা করলেন—তাঁর 'নবরত্ন' সভার শ্রেষ্ঠ 'রত্ন' বলে। এবং উপাধি দান করলেন, কবি রায়গুণাকর বলে। †

† মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্রকে রচনা করতে হয় মহামায়া মহাশক্তি অন্নদায়িনী অন্নদার চরিতাখ্যান—অন্নদামঙ্গল কাব্য। আর ভারত-চন্দ্র সেই অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করে শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে, 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত হন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে। যৌবনের প্রথম অবস্থায় ভারতচন্দ্র ছিলেন সামান্য এক গ্রাম্য কবি।

কথাগুলি নিজের মনে ভাবলেন রায়গুণাকর। এবং নিজের মনে ভেবেই, দ্বিতীয়বার কোন কিছু না বলে শুধু নীরব হয়ে রইলেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে এমনিভাবে নীরব হয়ে থাকতে দেখে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সহাস্যে বললেন—কি? কি ব্যাপার কবি, হঠাৎ এমনভাবে নীরবতা অবলম্বন করলে কেন?—তা'ছাড়া ভাবছই বা কি?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে, একটা অতি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বললেন, না! এমন কিছুই ভাবছি না। মহারাজ, যাঁরা অতীত জীবনকে ভুলে যায় বোধহয় তাদের মতো নরাধম পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই। তাই না মহারাজ?—তাই আপনার কথা শুনে একবার আমার অতীত জীবনের কথা চিন্তা করছিলাম। এবং এই অতীত জীবনে ফিরে গিয়েই একটু ভাবিত হয়ে পড়লাম।

—ওঃ তাই বুঝি! তবে হাঁ, যে বর্তমানের সুখানন্দের মধ্যে থেকে, অতীত জীবনকে ভুলতে চায় তার মতো পাষণ্ড নরাধম আর দুটিও থাকে না। তাই বলি কবি, প্রতিটি বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে, তাদের অতীত জীবনটাকে উপেক্ষা করা কখনোই উচিৎ নয়। কেননা, এই 'অতীতকে কেউ কখনও ভুলতে পারে না। আর যে বলে 'আমি ভুলেছি', তার মত মিথ্যাচারী আর একটিও নেই। বলেই মহারাজা একটুখানি নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন, তবে হাঁ, বর্তমানে যা সত্য বলে উপলব্ধি করবে, সেই সত্যটাকে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। কেননা,—বর্তমানের সঙ্গে অতীতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে,—তাই নয় কি কবি?

—একথা বোধহয় আমার থেকেও রায়গুণাকর সর্বান্তকরণে সমর্থন করবেন!

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু নীরবে মস্তক নেড়ে সম্মতি জানালেন ভারতচন্দ্র।

॥ ১৮ ॥

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাধক কবি রামপ্রসাদকে অনুরোধ করলেন —রামপ্রসাদ, তুমি আমার রাজধানী কৃষ্ণনগরে গিয়ে মাতৃনাম গান শুনিয়ে আসবে।—শুধু আমাকে নয়, আমার রাজ্যে যাঁরা বাস করেন, অর্থাৎ আমার প্রজাদেরও, তোমার কণ্ঠের অমৃতময় মাতৃনাম গান শুনিয়ে দিয়ে আসবে।

বার বার রামপ্রসাদকে এই অনুরোধ জানালেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু রামপ্রসাদ তাঁর এই অনুরোধে কোনরূপ সম্মতি না জানিয়ে শুধু বললেন, মহামায়া, মহাশক্তির আদেশ হলেই আপনার এই অনুরোধ রক্ষা করবার চেষ্টা করবো। কিন্তু, তার পূর্বে আপনাকে কথা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রশান্ত নির্বিকার কণ্ঠস্বরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সানন্দে ঘোষণা করলেন —বেশ। রামপ্রসাদ, যেদিন মহামায়া মহাশক্তি শ্যামা মায়ের আদেশ হবে সেই দিন তুমি আমার কৃষ্ণনগরে গিয়ে মাতৃনাম গান শুনিয়ে আসবে!

রামপ্রসাদকে এমনি ভাবে অনুরোধ জানাবার কয়েকদিন পরেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বনামে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য 'কৃষ্ণনগরে'* ফিরে গেলেন, হালিশহর গ্রাম পরিত্যাগ করে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র হালিশহর গ্রাম পরিত্যাগ করার পর থেকেই আত্মভোলা রামপ্রসাদ, সব সময় যেন আত্মসমাহিত ভাবে মাতৃনাম গানে বিভোর হয়ে থাক্‌তেন।—কেন না জগৎ সংসারে একমাত্র

* মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্ব-নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তার নাম দেন 'কৃষ্ণনগর'। আর এই কৃষ্ণনগরেই একটা রাজ সভাও তৈয়ারী করান; এই ছাড়া নবদ্বীপেও তাঁর আর একটি রাজমহল ও রাজসভা ছিল। কথিত আছে —সময় সময় তিনি স্ব-পরিষদ নিয়ে, নবদ্বীপ থেকেও রাজ কার্য পরিচালনা ও শাসন কার্য নির্বাহ করতেন।

জগন্মাতাই তাঁর কাছে সর্বস্ব হয়ে রয়েছে—'মা-ই কর্মা-কর্ম; মা-ই ধর্মা-ধর্ম। মা-ই পরম তপঃ।'

মহামায়া মহাশক্তি ভিন্ন জগতে আর কে আছে। তাই ত রাম-প্রসাদ একমাত্র নাম গানের মধ্যেই, আকুল আবেদন জানান, আবদার করেন, অভিমান করেন, ক্রোধ প্রকাশ করে সময় সময় গালিও দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন না। আর—করবেনই বা কেন? যাঁর মন-প্রাণ সর্বস্ব জগৎ মাতার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পন করে দিয়েছেন; তাঁর দ্বিধা বা কোনরূপ সংকোচ আসতে পারে না। তাছাড়া জগন্মাতা এই সব দ্বিধা সংকোচের বালাই রাখেন না।

অভিমান ভরে, ক্রোধ করে কিংবা গালি দিয়েও রামপ্রসাদের অতৃপ্ত মন তৃপ্ত হয় না।—আর মনের মধ্যে শান্তিও পান না। শুধু একটা অজানিত আকাঙ্ক্ষা; জগন্মাতার চরণ পাবার জন্য একটা অতৃপ্ত বাসনাই তাঁর মনকে বার বার উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে।—আর সেই আখাঙ্ক্ষা যে, শুধু ভোগবাসনা আর কামনাকে পরিপূর্ণ করবার জন্য নয়। কিংবা প্রভুত ধন-দৌলতের জন্য নয়।—কেন না এই অপার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা রামপ্রসাদের মনের মধ্যে কোন দিনের জন্য স্থান পায়নি।

যাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে একমাত্র মা'কে পাবার জন্য, মা'কে দর্শন করবার জন্য, সদা-সর্বদা আকাঙ্ক্ষা জেগে রয়েছে, সেখানে আর কিছুই আসতে পারে না।—শয়নে-স্বপনে আর জাগরণে, জগৎমাতাকে দর্শন করবার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। আকুল হয়ে ওঠেন মাকে একান্তে পাবার জন্য।

কখনো কোন সময়ে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন রামপ্রসাদ মা—মাগো,—দেখা দে মা!—দেখা দে!—একটি বার দর্শন দিয়ে আবার লুকিয়ে থাকলে কি সন্তানের মাতৃদর্শনের তৃষ্ণা মিটে যায়? তাই ত সকল সময়, সর্বক্ষণের জন্য কাঁদেন রামপ্রসাদ।—আশা করেন মাতৃদর্শন লাভের।

আকুল হয়ে উঠেছেন রামপ্রসাদ; আর সেই আকুলতায়, সেই

আর্তিতে তাঁর সমস্ত মন যেন ভরে উঠতে চায়। আবার কখনো বা, কোন সময়ে মা-মা বলে কাঁদতে কাঁদতে গাইতে থাকেন,—ওমা, আমার—

"গেল না গেল না দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না ছাড়িয়ে ছলনা,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হ'লো কাল॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তায় দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া-জ্বালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুন জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস,
পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হল কালা,
তোলা দুধে ছেলে, বাঁচে কত কাল॥"

আবার কখনো বা রামপ্রসাদ কেমন এক ভাবাবিষ্টের মত গেয়ে ওঠেন —

"অভয় চরণ সব লুটালে।
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে, শিখেছিলে মা বাপের কুলে।
তোমার পিতামাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা কি আমায় হ'লে॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
সদা ভাং খেয়ে সে মত্ত ভোলা, তুষ্ট কেবল বিল্বদলে॥
মা হোয়ে মা জন্মে জন্মে, কত দুঃখ আমায় দিলে।
প্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাকবো সর্বনাশী বলে॥"

† সাধক কবি রামপ্রসাদের মাতৃনাম গানের সঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ ইত্যাদি আরো কয়েকজন রামপ্রসাদ নামধারীর মাতৃনাম গান অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছে। তা' আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

জন্য বিরত হন না। ক্রোধ কিংবা অভিমান ভরে জগন্মাতাকে গালি দিতে দ্বিধা করেন না। শুধু অন্তরের অন্তর্যামীনী জগন্মাতাই একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রামপ্রসাদের মনের আকুল আর্তিতে, আকুল ক্রন্দনে জগন্মাতার হৃদয় বুঝি একটু দ্রবীভূত হলো।—তাই একদিন তাঁর ভাবাবিষ্টের মধ্যে জগন্মাতা বললেন, তুই অত উতলা হয়ে উঠ্‌ছিস কেন বাছা?

—কেন যে তোর জন্য উতলা হই, তা কি তুই জানিস্ না মা। মাকে কাছে না পেলে যে, মায়ের জন্য সন্তান চিরদিনই কেঁদে থাকে।

—আমি যে তোর কাছেই রয়েছি, তবু তোর এই কান্না কেন?

—কাছে থাক্‌লেই কি সবকিছু হয়?

রামপ্রসাদের ভাবাবেশ ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু, একটা নিমেষের মধ্যেই আবার তাঁর সমস্ত অন্তর কেঁদে ওঠে—মা—মাগো, তুই যদি সব সময় আমার কাছে থাকিস, তবে কেন তোকে দেখতে পাই না, মা। কেন তুই তবে ধরা দিস না? বলেই রামপ্রসাদ আবার গেয়ে ওঠেন—

"দুঃখের কথা শোন মা তারা।
আমার ঘর ভাঙ্গ নয় পরাৎপরা॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এমনি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব-ঘরে ফেরাঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্তা যে জন, স্থির নহে মন, দু'জনেতে কল্লে সারা॥"

এমনি ভাবে রামপ্রসাদের দিনের পর দিন, আর রাতের পর রাত অতিবাহিত হয়ে যায়।—তার পর মাস। তাও অতিবাহিত হবার উপক্রম হয়ে ওঠে। আত্মসমাহিত আত্মভোলা রামপ্রসাদ, কখনো

ওঠেন।—মনের সমস্ত সত্তাকে একমাত্র জগৎমাতার রাঙা পাদপদ্মে বিসর্জন দিয়ে 'মা মা' বলে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন; আবার—কখনো বা আত্মসমাহিত ভাবে মাতৃনাম গানে আকাশ-বাতাসকে মথিত করে তুলতে থাকেন।

একই ভাবে আরো কয়েক দিন অতিবাহিত হয়ে যাবার পর, জগন্মাতার আবার আদেশ পেলেন রামপ্রসাদ।

আদেশ পেলেন—রামপ্রসাদ, তোকে কৃষ্ণনগরে যেতে হবে।

—কেন মা, আবার কৃষ্ণনগরে কেন?

—তোর সত্যরক্ষা করবার জন্য। তা'ছাড়া সেখানে তোর আরো প্রয়োজন আছে।

—প্রয়োজন আছে? কি প্রয়োজন মা?

—তা পরে জানতে পারবি।

—বেশ মা! কবে যাত্রা করতে হবে?

—আজই। আজ রাত্রেই।

—বেশ! মা, তোর আদেশই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

মাগো তোর এই আদেশে আজই আমি যাত্রা করব কৃষ্ণনগরে। নিজের মনে কথাগুলি ভেবে নিয়ে কৃষ্ণনগরের পথে যাত্রা করবার আয়োজন করতে লাগলেন অন্তর্যামীনী তারা মায়ের নাম স্মরণ করতে করতে।—

'ইচ্ছাময়ী তারা মাগো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

॥ ১৯ ॥

মহামায়া মহাশক্তি, তারা মায়ের আদেশে রামপ্রসাদকে যাত্রা করতে হলো কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন রামপ্রসাদ।

সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ! কোথাও বা গভীর ঘন বন, কোথাও বা দস্যু-

তস্কর পূর্ণ পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছেন। কণ্ঠে শুধু অভয়ার অভয় মন্ত্র, মাতৃনাম গান। তাঁর এই চলার পথে বহু বিপদ-আপদ আসতে থাকে কিন্তু রামপ্রসাদ সব কিছুকেই উপেক্ষা করে পথ চলেন তারা ব্রহ্মময়ীর নামে।

সামনে দস্যু-তস্করের দল এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালেও, তাদের সেই পথরোধে এতটুকু ভীত না হয়ে, তাদের মাঝে সানন্দে গেয়ে ওঠেন মাতৃনাম গান—

"আর ভুলালে ভুলব না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উলব না গো।
সুখদুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলব না গো॥
ধনলাভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলব না গো।
আশাবায়ুগ্রস্থ হয়ে মনের কথা খুলব না গো॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥"

রামপ্রসাদের মাতৃনাম গানে, তাঁর পথ রোধকারী দস্যু-তস্করের দল বিস্ময়ভরা চোখে তাকায় তাঁর মুখের দিকে। অথচ এক পা এগিয়ে এসে রাতের পথ যাত্রী রামপ্রসাদের সর্বস্ব হরণ করে নিয়ে, তাঁকে হত্যা করবার মতন কোন বাসনা জেগে উঠল না। বরঞ্চ একটা ভাবাবেগে তাদের সমস্ত মনটা যেন দুলতে থাকে।—আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবের ঘোরে বলে ওঠে—বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা ঠাকুর! আর রামপ্রসাদ? রামপ্রসাদও ভাবাবিষ্টের মতন গেয়ে চলেন, কালো মেয়ে, কালো কালীর নাম গান—

"আর তোরে না ডাকব কালী।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে লেংটা হয়ে রণ করিলি॥"

গাইতে গাইতে রামপ্রসাদ এগোতে থাকেন। আর তার পথ রোধকারী দস্যু-তস্করেরা তাঁর পথ ছেড়ে দিয়ে পথের দু'ধারে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু, রামপ্রসাদ?

রামপ্রসাদ তখনো গেয়ে চলেন—

"দিয়াছিলি একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি ॥
রামপ্রসাদ বলে মা গো এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে ভরা তুলে লাভে মূলে ডুবাইলি ॥"

দস্যু-তস্করের দল, রামপ্রসাদের মাতৃনাম গানে এতই মুগ্ধ হয়ে গেল যে,—তাঁর চলার পথকে পর্যন্ত রোধ করে দাঁড়াবার কথা ভুলে গেল। একটা অজানিত দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করতে থাকে।

অথচ—রামপ্রসাদের সেদিকে কোন নজর নেই। কোন প্রকার ভীতির সঞ্চার তাঁর মনের মধ্যে স্থান পেল না। যেন, মহামায়া মহাশক্তির আদেশে, আপন সুখে আপনিই পথ চলতে থাকেন।

আপন সুখে আপনিই পথ চলেন,—দিনের পর রাত, আবার রাতের পর দিন। আহার-বিশ্রামবিহীন ভাবে। অন্তরে শুধু 'করাল বদনী, শ্যামা মায়ের' রূপ মাধুরীর কথা। কণ্ঠে চির জাগ্রত করে রেখেছেন অন্তর্যামীনী লীলাময়ীর নাম গান।

"মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে ॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে ॥
জন্ম-জন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেমনি কর্ম তেমনি ফল, কর্মফলের ফল ফলেছে ॥
জমায় কমি খরচ বেশি, তরবো কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে (কেবল) কালীনাম
ভরসা আছে ॥"

এমনি ভাবে মাতৃনাম গাইতে গাইতে রামপ্রসাদ দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিবাহিত করতে লাগলেন। দিনের পর দিন, আর রাতের পর

রাত—তারপর ক্রমে সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর নূতন সপ্তাহের প্রথম দিন।

রামপ্রসাদের সেদিকে কোন হুঁস নেই। অন্তরে সদা জাগ্রত হয়ে রয়েছে, জগন্মাতার সেই কঠিন কঠোর আদেশ—ওরে তোকে কৃষ্ণনগরে যেতে হবে। সেখানে তোর অনেক কাজ আছে।

এর পরেও জগন্মাতা বলেছেন, কোন ভয় নেই রে। সব সময় তোর সঙ্গে সঙ্গেই আমি থাকবো।

তাইত জগন্মাতার এই কঠিন কঠোর অমোঘ বাণীকে একমাত্র মনের মধ্যে সম্বল করে নিয়ে, সহায়হীন হয়ে, একমাত্র 'করালবদনীর' নাম স্মরণ করতে করতে পথ চলেছেন।

কালী-তারার নাম গান গাওরে মন, কালী-তারার নাম গাও। কিন্তু—মনের মধ্যে একটা কিন্তু এসে মনকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তোলে রামপ্রসাদের। তাই তিনি সময় সময় ভাবেন—না জানি, তারা মা আমায় কোন কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করবার জন্য নিয়ে চলে।

নানা ভাবনা এসে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে আশ্রয় নিলেও, তবু তিনি সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, একমাত্র অভয়ার অভয় পদে সমস্ত কিছুকেই বিসর্জন দিয়ে, শুধু এক মনে প্রার্থনা জানাতে থাকেন। মাগো তোমার কর্ম তুমিই করবে। আমি ত কোন ছার! তোমার সুতোর টানে, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই আমাকে যেতে হবে; যেখানে ঘোরাবে সেখানেই ঘুরতে হবে!

অন্তরের সমস্ত আবেদন, আকুতি মিনতি সবকিছুই জগন্মাতার পদের উপর ছেড়ে দিয়ে সাধক কবি রামপ্রসাদ আপন ভাবে বিভোর হয়ে মাতৃনাম গান করতে করতে পথ চলতে থাকেন—

"অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।।
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি ।।

দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি ॥
সারাৎসার তারানাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে, যাত্রা করে বসে আসি ॥"

মাতৃভাবে পাগল হয়ে রামপ্রসাদ পথ চলেছেন। শত বাধা বিপত্তি পশ্চাতে রেখে, মৃত্যুর দোসরদের সঙ্গে মন মিলিয়ে আর তাদেরকে ভাব সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে তিনি এই সব বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। এগিয়ে চল্‌লেন কৃষ্ণনগরের দিকে।

॥ ২০ ॥

দীর্ঘ কয়েক দিন, একনাগাড়ে পথ চলার পর অবশেষে রামপ্রসাদ এসে উপস্থিত হলেন কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে।

কত রাত্রি, কত দিন তাঁর জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ধুলি-ধূসরে তাঁর সমস্ত দেহটা একটা অদ্ভুত ধরনের রূপ ধারণ করেছে। তাঁকে দেখে একজন পাগল ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবা যায় না। সদানন্দময় আত্মভোলা রামপ্রসাদ তাঁর সেদিকে কোনরূপ নজর দেবার অবসর পেলেন না। আর নজর দেবার অবসরই বা কোথায়?

যে মুহূর্তে কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন, সেই মুহূর্তে একটা অজানিত আনন্দে তাঁর সমস্ত অন্তরটাই যেন ভরে ওঠে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে কেন এই অজানিত আনন্দের সঞ্চার হলো। তাই তিনি মনে মনে ভাবেন, না জানি মহামায়া মহাশক্তির এ কি লীলাখেলা! লীলাময়ী তারা মায়ের একি রঙ্গ!

নিজের মনে ভাবেন আর আত্মসমাহিতভাবে মহামায়া মহাশক্তির নামগান করতে থাকেন—

"দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্‌বসনা ॥

মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা ॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না ॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্বাণে কি গুণ বল না ॥”

অন্তরের সমস্ত আবেগ আর আকুতি দিয়ে রামপ্রসাদ মাতৃনাম গান করতে করতে পথ এগিয়ে চললেন।

তখন প্রভাতী সূর্যের প্রথমালোকের স্পর্শে সমস্ত নগর জেগে উঠেছে—জেগে উঠেছে রাখালী বাঁশের বাঁশীর মধ্যে 'ইমন্' রাগের এক বৈচিত্র্যময় সুর। আর তারই মাঝে রামপ্রসাদ আত্মসমাহিত-ভাবে মাতৃনাম গানে সমস্ত কিছুকেই স্তব্ধ করে পথ এগিয়ে চলেন। আর তাঁর কণ্ঠে মাতৃনাম গান শুনে পথিকের দল স্তব্ধ বিস্ময়ে পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে। কর্মরত গৃহস্থ বধূরা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যে যার কর্ম পরিত্যাগ করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকেন সেই মাতৃনাম গান। বৌ-ঝিয়েরা হাতের কাজ ফেলে রেখে ছুটে এসে কেউ বা জানালার ফাঁক দিয়ে, আবার কেউ বা বন্ধ দরজা একটুখানি ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে —কে গাইছে।

কোন কোন বৃদ্ধ বলেন, কে গাইছে রে?

উত্তর আসে—কে জানে বাবা!

আবার কারো কারো কণ্ঠে শোনা যায়, আহা! মায়ের নামের মধ্য দিয়ে আজ সকালটি আরম্ভ হলো। বোধহয় দিনটি ভালই কাটবে!

কিন্তু রামপ্রসাদ! রামপ্রসাদ আপন খেয়ালে পথ চলেন। মনের মধ্যে একমাত্র চিন্তা মাতৃনাম। আর কণ্ঠে মাতৃনাম গান।

সদানন্দময়ী তারামায়ের নাম করতে করতে পথ চলতে লাগলেন। মাঝে, দু'একজন পথিককে জিজ্ঞেস করে নেন্ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে যাবার পথটি।

রাজপ্রাসাদ যাবার পথটি জেনে নিয়ে আবার আপন খেয়ালে

আর আপন মনেই পথ চলতে থাকেন। আপন খেয়ালে গাইতে থাকেন—

এলোকেশী দিগ্বসনা।
কালী পুরাও মোর মনোবাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া, বলে দে মা ঠিক-ঠিকানা॥
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
ওমা তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানে না॥" *

প্রভাতী সূর্যের স্নিগ্ধতা দূরীভূত হয়ে তার তীব্রতা ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে। আর সূর্যের সেই তীব্রতায় পথের পথিকেরা একটা ক্লান্ত ভাব অনুভব করতে থাকে। এবং সেই ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ নিয়ে ধীর পদক্ষেপে তারা সকলেই পথ চলে। রামপ্রসাদের কোন ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। একটা উদাস ভাব নিয়ে তিনি পথ চলেন রাজপ্রসাদের উদ্দেশ্যে! কণ্ঠে তাঁর মাতৃনাম গান। আর সেই মাতৃনাম গানে সকলের মনের মাঝে একটা আনন্দের সঞ্চার করে দিয়ে গেয়ে চলেন—

"জগত-জননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগৎ ছাড়া গো তারা॥
দিবা-অবসানে রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা,
মা হ'য়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া,
কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তানছাড়া গো তারা॥

---

* রামপ্রসাদের এই গানটি অসম্পূর্ণ। কারণ এর বাকী অংশ পাওয়া যায়নি।

আত্মভোলা রামপ্রসাদ; আত্মসমাহিত ভাবে মাতৃনাম গান গাইতে গাইতে অবশেষে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। রাজপ্রাসাদের সামনে এসে একটু ভাবিত হয়ে পড়লেন। কারণ প্রহরা বেষ্টিত রাজপ্রাসাদে কিভাবে প্রবেশ করবেন। কে বা তাঁকে চিনবেন। কথাগুলি ভেবে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জগৎমাতার নাম স্মরণ করতে লাগলেন।

সেই মুহূর্তে একজন সামন্ত এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'ঠাকুর' মহারাজা আপনাব জন্য অপেক্ষা করছেন; আজ্ঞা করেন ত পথ দেখিয়ে নিয়ে চলি।

রামপ্রসাদ চমকিত হয়ে বললেন,—কে ?

সামন্ত বললেন, আমাদের মহারাজ শ্রীল্ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র! আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করেছেন, এই বান্দাকে।

—ওঃ! মহারাজা তোমাকে পাঠিয়েছেন? বেশ চল!

—আমার সঙ্গে আসুন ঠাকুর। বলেই সেই সামন্ত পথ এগিয়ে চলল। রামপ্রসাদ তার পথানুসরণ করলেন!

॥ ২১ ॥

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগত সামন্ত বা ভৃত্যের সঙ্গে, রামপ্রসাদ এসে উপস্থিত হল রাজবাড়ীতে।

রাজবাড়ীতে এসে উপস্থিত হতেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, এসো রামপ্রসাদ! তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি! পথে কোন কষ্ট হয়নি ত?

রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে বললেন, জগন্মাতা মহামায়ার আদেশে আজ দীন ভিখারীকে আসতে হলো মহারাজ! অপরাধ গ্রহণ করবেন না!

রামপ্রসাদের কথা শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, রামপ্রসাদ অমন কথাটি বলো না। জগন্মাতার দরবারে কে না দীন ভিখারী। স্বয়ং ত্রিপুরারীকেও দীন ভিখারী হয়ে অন্ন ভিক্ষা করতে হয়েছে। তা ছাড়া আমরা যে কোন ছার!

—সে কথা ধ্রুব সত্য কিন্তু—

না রামপ্রসাদ এর মধ্যে আর কোন কিন্তু আসতে পারে না। তা'ছাড়া তোমাকে যে কৃষ্ণনগরে আসতে হবে তা' আমি জানতাম। তাই 'হালিশহর' থেকে ফিরবার মুখে তোমাকে আসবার জন্ম আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম! বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর একটুখানি নীরব থেকে পুনশ্চ বললেন—যাক্। আজকের মতন তুমি বিশ্রাম কর; কাল রাজসভায় অনেকগুলি লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। আশা করি—

তারা তোমায় দেখলে খুশী হবেন; আর তুমিও বোধ হয় তাঁদের দেখলে আনন্দিত হবে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে, আত্মভোলা রামপ্রসাদ বললেন, মহামায়া মহাশক্তির ইচ্ছা যেন তাতেই পূর্ণ হোক! বলেই রামপ্রসাদ আপন খেয়ালের বসেই গেয়ে উঠলেন মাতৃনাম গান—

"ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব তরী কারণ-জলে॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে,
ওরে কেউ করিল ছনো ব্যাপার, কেউ হারালে লাভে মূলে॥
ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ মরুদ্‌ব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গোড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে॥"

রামপ্রসাদের কণ্ঠের এমনি নামগান শুনে রাজপ্রাসাদের অনেকে ছুটে এসে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে। আর মনে মনে ভাবে এ আবার কোন দেশের পাগল এলো। কিন্তু—

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র 'ধন্য ধন্য' করে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, সার্থক রামপ্রসাদ। সার্থক তুমি। তোমার কণ্ঠের মধুর মাতৃনাম গান সমস্ত আকাশ-বাতাসকে স্তব্ধ করে দেয়। কিন্তু যাক্, তুমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, আজ আহারাদি করে বিশ্রাম কর। কাল রাজসভায় তোমার কণ্ঠে মাতৃনাম গান শুনে নিজের আর আমার প্রজাদের জীবন সার্থক করে তুলবো। বলেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অনুগত ভৃত্যকে আদেশ করলেন রামপ্রসাদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা করে দেবার জন্য।

* * *

মধ্যাহ্নের সূর্য তখন অপরাহ্নের ছায়া তলে এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তার শেষ আলোকটুকু ধরিত্রীর বুক থেকে নিঃশেষ হয়ে মুছে গিয়ে গোধূলির একটা ধূসর রূপে পরিণত হবে, অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারের কালো যবনিকাকে সমস্ত ধরিত্রীর বুকের উপর ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার বন্দনা গানের আয়োজন করবে। রামপ্রসাদ রাজপ্রাসাদে তারই জন্য নির্দিষ্ট করা ঘরের মধ্যে ক্লান্তি অপনোদন করতে করতে নিজের মনে ভাবছিলেন, না জানি মহামায়া কি অভিপ্রায়ে আজ তাঁকে এই কৃষ্ণনগরে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু, যে কারণেই হোকনা কেন, একমাত্র অভয়ার অভয় পদযুগল ছাড়া আর কিছুই মনের মধ্যে স্থান দেবেন না।

কেননা, সাধকেরাই বলেছেন, জগৎ মাতার কাছে বা ঈশ্বরের কাছে কখনো 'সুখের' আশা কামনা করো না। 'সুখ সুখ' করলে শুধু সুখটাই পাবে। কিন্তু—শত সহস্র দুঃখের মাঝে যে সুখানুভূতি আছে, যে মাধুর্যতা আছে, যে আনন্দানুভূতি আছে তা' কখনো আস্বাদন করতে পারবে না। তাই দুঃখটাকে আগে কামনা কর।

শাস্ত্রকারেরাও বলেছেন, সর্ব দুঃখানিচঃ সুখানিচঃ। সকল দুঃখের মধ্যেই সুখ।

রামপ্রসাদ নিজের মনেই ভাবলেন, মনমোহিনী মহামায়া

তারা মা, আমায় চরম দুঃখের সাগরে ভাসান, তাতেই আমার আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হবে। নিজের মনে ভেবেই আপন ভাবে ভাবুক রামপ্রসাদ গুণ্ গুণ্ করে গাইলেন, 'কালী তারার নাম জপ রে মুখে।'

তখন গোধূলির ধূসর পাণ্ডুর রূপ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গিয়ে, নিথর কালো অন্ধকারের কালো যবনিকা অনন্ত পৃথিবীর বুকের উপর আচ্ছাদিত হয়েছে। দূরাগত কোন মন্দিরের বা দেবালয়ের সান্ধ্য আরতির 'শঙ্খ-ঘন্ট, আর কাসরের' বৈচিত্রময় ঐকতান ভেসে আসে। ভেসে আসে শ্যামগীতের মন মোহনীয়া সুরলহরী।

ওঁমকার ধ্বনির সঙ্গে শ্যামগীতের সুর ধ্বনি মিলিত হয়ে এক নব সঙ্গীতের বৈচিত্রময় রূপের সৃষ্টি করে ভক্তি রসে আপ্লুত করে সকলের মনকে, কোন্ এক অজানা ভাব সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে রামপ্রসাদের মনকেও। ভাবাবিষ্ট রামপ্রসাদ গেয়ে চলেছেন। প্রথমে কণ্ঠের সুর 'খাদে' বইতে থাকে। তারপর 'খাদের' থেকে সপ্তমে চড়ে যায়—

"কালী তারার নাম জপ মুখে রে।
যে নামে শমন-ভয় যাবে দূরে রে॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে।
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি-স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে রেখো রে॥"

আত্মভোলা রামপ্রসাদ, স্থান কাল ভুলে গিয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে গেয়ে চলেন। আবার কখনো বা খাদে নামিয়ে নেন স্বরগ্রাম। সমস্ত রাজপুরী যেন স্তব্ধ হয়ে কোন এক ভাব সাগরে ভাসতে থাকে।

রামপ্রসাদ আপন ভাবে তখনো গেয়ে চলেছেন—

"কালী গো কেন লেংটা ফের।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসন-ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো, এই কি তোমার কুলের ধর্ম, পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মাগো, আমরা সবে ম'রি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥
ত্যজি রত্নহার মা, তোমার ও কণ্ঠে শোভে নরশির।
প্রসাদ বলে ঐ রূপে মা ভয় পেয়েছেন দিগম্বর॥"

রামপ্রসাদেব কণ্ঠের মাতৃনাম গান এক সময় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার সুর ঝঙ্কার সমস্ত রাজপ্রাসাদে তখনো 'গম্ গম্' করতে থাকে। আত্মসমাহিত ভাব থেকে প্রকৃতিস্থ হয়ে, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন রামপ্রসাদ।

এক সময় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বলে উঠলেন, সার্থক রামপ্রসাদ। সার্থক তোমার মাতৃবন্দনা। তোমার কণ্ঠের মাতৃনাম গানে আজ আমার রাজপ্রাসাদ একটা পুণ্যময় তীর্থে পরিণত হয়ে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় রামপ্রসাদ পুনশ্চ আর এক গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, মহারাজা, আপনার বিরাট রাজ প্রাসাদকে পুণ্যময় তীর্থে পরিণত করবার মত শক্তি আমার কোথায়। মা-কে ভালবাসি, তাই আপন মনে মাতৃনাম গান করি। মহারাজ, আমি তন্ত্র জানি না, মন্ত্র জানি না, জানি না মায়ের পূজার উপাচার। শুধু মা-কে দেখবার জন্য, মায়ের কোলে উঠবার জন্য আকুল হয়ে ডাকি।

—এই আকুল ডাকটাই যে তোমার সব। তন্ত্র-মন্ত্র, পূজা-অর্চনা আর বাহ্যিক আড়ম্বর থেকে তোমার মাতৃনাম গান অনেক উর্দ্ধে। বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

এই কথা কয়টি বলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য নীরব থেকে পুনঃশ্চ বললেন, রামপ্রসাদ, রাত্রি দ্বিতীয় যাম অতিবাহিত হতে চলেছে, একটু আহারাদি করে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। কাল

সকালে রাজসভাতে তোমার সঙ্গে পুনরায় দেখা হবে। এখন আমি উঠি রামপ্রসাদ।

—আসুন মহারাজ। আত্মগতভাবে উত্তর দিলেন রামপ্রসাদ। তখন রাত্রি দ্বিতীয় যাম অতিক্রম করে, তৃতীয় যামে পদক্ষেপ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

॥ ২২ ॥

মহামায়া মহাশক্তির লীলার অন্ত যেমন নেই, তেমনি কালের মাঝে ফেলে পাক্-চক্রে ঘোরাতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন না। কেন না, এই বিশ্বসংসারের সমস্ত জীব তাঁর ক্রীড়ার পুতুল মাত্র। ইচ্ছাময়ী তারা মা যাঁকে যেমন করে ঘোরাবেন, তাঁকে তেমনিভাবে ঘুরতে হবে।

আর—এই পাক্-চক্র থেকে কেউ কখনো সহজে মুক্তি পায় না।

ধীরে ধীরে রাতের প্রহর শেষ হয়ে যায়। তমিস্রা রজনীর গাঢ় অন্ধকার ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে গিয়ে, ভোরের আলো আঁধারির খেলা শুরু হয়ে যায়। প্রভাতী বন্দনা-গায়ক বিহগ দল আগতপ্রায় প্রভাতের বন্দনা করবার আয়োজন করে কলকাকলী আরম্ভ করে দিয়েছে।

সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই রামপ্রসাদ সমাধি হ'তে তারা নাম স্মরণ করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আপন মনেই মাতৃনাম গানে, আগত প্রভাতকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। একবার তারা নাম জপরে মন, একবার তারা নাম জপ্। যে নাম জপ্ করলে, মৃত্যু-ভয় আর আপদ বিপদ সব দূরে সরে যায়। যে নাম-মন্ত্র 'মড়ার' কানে দিলে, মড়ার দেহে আবার নূতন করে প্রাণ সঞ্চার হয়ে উঠে। সেই একমাত্র তারা নামই সার। বহু মুনি ঋষি ও শাস্ত্রজ্ঞ

পণ্ডিতেরা বলে গেছেন, "নামৈয়ে কেবলম্।" কিন্তু রামপ্রসাদ শুধু নাম করতে চান না।

চান, নামগানের ভিতর দিয়ে জগন্মাতার পাদপদ্মকে আপন হৃদি পদ্মাসনে চির প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে। আকুল আকুতির ভিতর দিয়ে। তাই তারা 'নামগানে' আগত দিনকে অভিনন্দিত করতে লাগলেন—

"একবার ডাকবে কালী তারা ব'লে, জোর ক'রে রসনে।
ও তোর ভয় কিরে শমনে॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গাকাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্মকর্ম, ও তাঁর মর্ম যেবা জানে॥
ভজনের ছিল ভরসা, সূক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাবে ভেবে মনে॥"

রামপ্রসাদের কণ্ঠের মাতৃনাম গানে ভোরের বাতাস যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে যায় বিহগদলের কল-কাকলী। যেন তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে, প্রভাতী সূর্যের আলোও পর্যন্ত যেন সেই মাতৃনাম গানে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। আর রামপ্রসাদের কণ্ঠের মাতৃনাম গানে সমস্ত রাজপ্রাসাদের আরাম প্রিয় সকলেই তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে ছুটে আসে রামপ্রসাদ যে ঘরে রয়েছে সেই ঘরের কাছে। কিন্তু, রামপ্রসাদ আত্মহারা। আত্মহারা ভাবে মাতৃনামগান গেয়ে চলেন।

"একবার ডাক্‌রে মন, একবার ডাক্‌রে কালী তারা ব'লে। এই ভবসংসারে কালী তারা বিনে কেবা আছে আর।"

ভোরের বিহগদল আগত প্রভাতী ভাস্করের বন্দনা গীত ভুলে গিয়ে যেন, মাতৃনাম গানে উন্মাদ হয়ে ওঠে। তারা সকলেই যেন কল-কাকলীর ভিতর দিয়ে বলে ওঠে 'তারা তারা, কালী তারা'র নাম কর।

রামপ্রসাদের কণ্ঠের মাতৃনাম গানে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ান রামপ্রসাদের থাকার জন্য যে ঘরটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সেই ঘরটি মধ্যে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে

দেখলেন মাতৃনাম গানে আত্মহারা রামপ্রসাদ ভাব উন্মাদনায় যেন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন এই ভাব উন্মাদ রামপ্রসাদের মুখের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা অজানিত আনন্দের ধারায় তাঁর মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তারপর পরিপূর্ণ একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলে ধীর অথচ প্রশান্ত স্বরে বলে উঠলেন, স্বার্থক হয়ে উঠেছে আমার এই রাজপ্রাসাদ। ধন্য হয়ে গেছে তোমার চরণধূল পড়ে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথাতে সমাধিস্থ রামপ্রসাদের ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। তিনি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে, তারপর ধীর অথচ প্রশান্ত স্বরে বললেন, মহারাজ, সবই মহামায়া মহাশক্তি তারা মায়ের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ।

—ঠিক্ই বলেছ রামপ্রসাদ। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা না হলে কেউ কিছুই করতে পারে না। বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর একটুখানি নীরব থেকে বললেন, যাক্ তুমি অবগাহনাদি সমাপ্ত করে এসো, ততক্ষণ আমিও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিগে। বলেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রস্থান করলেন।

রামপ্রসাদ আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে, রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ নদীর উদ্দেশ্যে মাতৃনাম স্মরণ করতে করতে যাত্রা করলেন। তখন প্রভাতী ভাস্কর পূর্বাশার দিক্চক্রবালে আপনার রশ্মিজাল ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আপন প্রভাব প্রচার করবার আয়োজন করে চলেছে।

॥ ২৩ ॥

প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকের ঝর্ণাধারা ক্রমশঃ দীপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। জনগণ বা কৃষ্ণনগর বাসীরা সকলেই জাগ্রত হয়ে স্বঃ স্বঃ কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রাখাল বালকের দল গরু-বাছুরকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, কোন দূর-দূরান্তে বনানীর উদ্দেশ্যে। আর তাদের কণ্ঠের একটা বিচিত্র কলরব, একটা সঙ্গীতের মোহন সুরের মতন প্রভাতী সমীরের হিল্লোল ভেসে আসে। আবার কোন কোন রাখাল বালকের বাঁশের বাঁশরীর মোহন সুর লহরী জেগে ওঠে। সেই সুরলহরী শুনে, মনের মধ্যে জেগে উঠে রাখালরূপী শ্রীকৃষ্ণের বংশীবদন মূর্তির কথা।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় একটা বিরাট সভার আয়োজন চলেছে। অবশ্য এই সভাকে একটা অভ্যর্থনা সভা বললেও বিশেষ অত্যুক্তি হবে না। কেন না মহারাজা এই সভার আয়োজন করছেন মহামায়া মহাশক্তি তারা মায়ের একমাত্র ভক্ত সাধক কবিকে সমাদর দেবার জন্য। তাছাড়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আরো একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপ দান করবার বাসনায় এই রাজসভার পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হয়েছেন।

অর্থাৎ, তাঁর সভাকবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গে পল্লী বাংলার সাধক ভক্ত কবির মিলন ঘটাবার জন্য। তাই এই আয়োজন, এই পরিবর্তন।

তখন প্রভাতী ভাস্কর তার দীপ্ত জ্যোতি ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত করে চলেছে। একে একে সভাসদ, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী সকলে এসে সভায় উপস্থিত হ'তে লাগলেন; আর দ্বাররক্ষী সান্ত্রী তাঁদের সকলের আগমনবার্তা ঘোষণা করে জানিয়ে দিতে লাগল।

সভাসদ, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী সকলে রাজসভায় প্রবেশ করে, স্ব স্ব আসনে উপবেশন করে প্রথমে রাজসভার একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে আশ্চর্যবোধ করলেন। কিন্তু কেউ কোন কথা ব্যক্ত না করে শুধু অপেক্ষা করতে লাগলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আগমনের অপেক্ষায়।

এমন সময় দ্বারী আবার ঘোষণা করল—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আগমন বার্তা।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রাজসভায় প্রবেশ করেই প্রথমে বিস্মিত

হয়ে গেলেন। কিন্তু, কোনরূপ বাক্য ব্যয় না করে স্ব-আসনে উপবেশন করে, চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলেন। অথচ কোন কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতে প্রয়াসী হ'লেন না। কারণ তাঁর তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, রহস্যময় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোন এক রহস্যকে সকলের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটন করে, সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য এই আয়োজন করেছেন। অতএব মহারাজ রাজদরবারে না আসা পর্যন্ত সকলকে প্রতীক্ষা করতে হবে।

যখন রায়গুণাকর এমনি নানা কথা ভাবছিলেন, ঠিক্ তেমনি সময়ে ঘোষক ঘোষণা করলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আগমন বার্তা।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই আগমন বার্তা শুনেই সকলে ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন। চারণেরা মহারাজের জয় গান করতে লাগলেন। ভাটের দল স্বস্তি বচন আওড়াতে লাগলেন,—ভাটেদের 'স্বস্তি বচন' থামতে না থামতেই বাদকের দল, সারেঙ্গ-মৃদঙ্গতে সুমধুর তান জাগরিত করে, রাজসভাকে মুখরিত করে তুল্‌তে লাগ্‌লেন। ব্যজন-কারিণী সুন্দরীরা ব্যজন করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। ঠিক সেই সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাধক কবি রামপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে রাজদরবারে এসে প্রবেশ করলেন। এবং তিনি দরবারে প্রবেশ করে রাজ সিংহাসনে উপবেশন করতেই রাজপুরোহিত স্বস্তি বচন পাঠ করে মহারাজার দীর্ঘায়ু কামনা করতে লাগলেন।

চারণের দল, স্বস্তি বচন পাঠ সমাপ্ত হ'তে না হতেই মহারাজের জয়গীতি ও দান-ধ্যান এবং নানাবিধ সৎ আর মহৎ কাজের কথা উল্লেখ করে, জয়গান করতে লাগল।

নর্ত্তকীর দল লীলায়িত ছন্দে নর্ত্তন করে মহারাজকে বার বার অভিনন্দন জানাতে লাগল। তাদের পদযুগলের নূপুরের মধ্যে এক মধুর ধ্বনি জাগরিত করে, সকলের মনকে মোহাবিষ্ট করে তুলতে লাগল। কোকিল কণ্ঠী গায়িকার দল, বীণার তারে একটা করুণ অথচ হৃদয়গ্রাহী সুরের মায়াজাল রচনা করে চলল।

তাদের এই মোহাবিষ্ট সুর ও গীতে রাজসভার সকলেই যেন

মোহাবিষ্ট হয়ে রইলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ? রামপ্রসাদ এই সব থেকে মনকে মুক্ত রেখে মাতৃনামে ভাবাবিষ্ট হয়ে রইলেন। কেবল, সমস্ত অন্তর জুড়ে সদা জাগ্রত হয়ে রইল অভয়ার অভয় রাঙা চরণ দু'খানি। যেন, তাঁর অভয় পদ পাবার আসে, কাঁদেন দিবা-নিশী।

* * *

মহামায়া মহাশক্তিই বুঝি আপন ভক্তকে চরম পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিংবা চরম দুঃখ-কষ্ট দিয়ে আপন ভক্তকে বার বার যাচাই করে নিতে চান।

যাচাই করে নিতে চান আপন ভক্তের সম্মুখে লোভ-ভোগ, বাসনা-কামনার পাবক শিখাকে জাগরিত করে তুলে।—মান-যশের জয় মুকুট আনয়ন করে। অর্থাৎ আপন ভক্ত সন্তানের সম্মুখে এইসব লোভনীয় বস্তুগুলি প্রদর্শন করিয়ে, আপন ভক্ত সন্তানের কণ্ঠের মাতৃনাম ডাককে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কেন না সন্তানের আকুল ক্রন্দনেই যে মায়ের জ্বালা বাড়ে। তাই সন্তানের ক্রন্দনকে ভোলাতে চান নানা ছলনা-কামনা, বাসনা দিয়ে। রামপ্রসাদের বেলায়ও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটান নি। তাই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়, সভাপ্রারম্ভের পূর্বেই যে ভোগ-বাসনা আর কামনার পাবক শিখা প্রজ্বলিত করে তুলিয়েছিলেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়ে, তাতে রামপ্রসাদের মনকে আবিষ্ট করাতে পারেন নি। পারেন নি সুন্দরী তন্বী নর্তকীর বঙ্কিম কটাক্ষে, কিংবা সুন্দরীর উন্নত স্তনদ্বয়ের লীলাময় নর্তনেও।—

যখন একে একে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও রামপ্রসাদের মনে কোনরূপ ভাবান্তর আনতে পারেন নি মহামায়া মহাশক্তি; তখনই মহারাজের কণ্ঠে স্বীয় তারানামকে জাগরিত করিয়ে রাজসভা আরম্ভ করালেন। এবং রাজকার্য আরম্ভ করাবার পূর্বেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, মন্ত্রী অমাত্য আর সভাসদগণ, আজ রাজসভার এই বিশেষ রূপ দেখে আপনারা সকলে একটু বিস্মিত

হয়েছেন, তার হয়তো অনেকেই ভেবেও থাকতে পারেন যে, রাজকার্য স্থগিত রেখে এই বিলাস-ব্যসনের আয়োজন কেন?—কেন এই আয়োজন তা' একমাত্র জগৎমাতা মহামায়াই জানেন। বলেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য থামলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে এমনি নীরব হতে দেখেও কোন সভাসদ একটি বাক্যও ব্যয় না করে শুধু অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর পরবর্ত্তী কথার জন্য। তা'ছাড়া তাঁরা সকলেই বুঝলেন যে মহারাজা আজ কোন রহস্যময় ঘটনা ব্যক্ত করে সকলের মনে তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্যই এই ভূমিকা করছেন। তাই সকলেই নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটুখানির জন্য নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন, মহামায়া মহাশক্তির ইচ্ছায় আমরা যাঁকে একান্তে পেয়েছি, তাঁর কথা পূর্বেই একদিন আমার রাজ সভায় সভাসদ ও রায়গুণাকর এবং আর সকলের কাছে ব্যক্ত করেছিলাম; আজ তাঁকে পেয়ে আমার রাজধানী ও রাজপ্রসাদ ধন্য হয়ে গেছে। বিশেষত দূর পল্লীবাংলার সেই সাধক কবি রামপ্রসাদ আজ এই সভায় উপস্থিত—মহারাজের কথা সমাপ্ত না হ'তেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর নীরবতাকে ভঙ্গ করে, একটু যেন ব্যঙ্গস্বরে বললেন, তাই বুঝি মহারাজ? আর তার জন্যই বুঝি আজ রাজসভার এই পট পরিবর্তন!

—'ইচ্ছাময়ীর' ইচ্ছায় সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ। আমাদের কি সাধ্য আছে, মহামায়া মা তারার পরিবর্তনশীল জগৎ সংসারে নূতন করে পরিবর্তন ঘটাবার। কিন্তু রায়গুণাকর, আজ এই বাক-বিতণ্ডার জন্য এই রাজসভার আয়োজন নয়। আমার দুঃখী প্রজাদের মনের দুঃখের মাঝে কথঞ্চিৎ শান্তিদান করাবার জন্য এই সভার আয়োজন। বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

এদিকে তখন রামপ্রসাদ আপন ভাবে বিভোর হয়ে অভয়ার অভয়

চরণযুগল দর্শন করতে লাগলেন। আর সেই রাঙা চরণযুগল দর্শন করতে করতে মাতৃনাম গান করতে লাগলেন—

"শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি।

(ভব-সংসার-বাজারের মাঝে)

ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি ॥

কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।

ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥

বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।

ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাতচাপড়ি ॥

প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।

ভবসংসার-সমুদ্রপারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥"

আত্মভোলা রামপ্রসাদের কণ্ঠের মাতৃনাম গানে সমস্ত রাজসভা যেন নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে যায় ভব সংসার সমুদ্রের অসহায় যাত্রীরা।

স্তব্ধ রাজসভা। স্তব্ধ সভাসদগণ। আর রায়গুণাকর স্তব্ধ হয়েই মনের মাঝে একটা ঈর্ষার ভাব পোষণ করতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন, কি করে এই গেঁয়ো কবি রামপ্রসাদকে জব্দ করা যায়!

* * *

রামপ্রসাদের কণ্ঠের মাতৃনাম গান শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার মোহনীয়া সুরধ্বনি তখনো রাজ সভার গম্বুজে গম্বুজে একটা মোহন সুরের আবেশ জাগিয়ে তুলে সকলকে যেন অবশ করে দিয়েছে।

অবশ করে দিয়েছে সুধাকণ্ঠীর সঙ্গীতের সুর ধ্বনিকে। মধুর বীণার সুতানকে স্তব্ধ করে দিয়ে ; রামপ্রসাদের কণ্ঠের সেই মাতৃনাম গানের অমৃতময়ী সুর যেন বার বার লহরী তুলে সকলের হৃদয়মনকে অবশ করে দিয়ে চলেছে।

আসক্তিবিহীন শুদ্ধ প্রেমগানের মধ্য দিয়ে আসে মুক্তি। রামপ্রসাদ সেই আসক্তিবিহীন মাতৃনাম গানের মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে

রেখেছেন। কারো ব্যঙ্গ ইঙ্গিতে, কারো বক্র দৃষ্টিতে তাঁর আত্ম-সমাহিত মনকে টলাতে পারে না কেউ। তাঁর সমস্ত তনুমন তারাময়ী হয়ে রয়েছে। তাই রামপ্রসাদের কণ্ঠের মাতৃনাম গান সমাপ্ত হতেই সমস্ত রাজসভার সভাসদেরা সুরের আবেশে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মূহ্যমান হয়ে থাকেন। রায়গুণাকর নীরব স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে বলে উঠলেন, বাঃ! মহারাজ! আপনার রামপ্রসাদের কণ্ঠের মাতৃনাম গান অপূর্ব! এমন কি সকলকে মূহ্যমান করে রাখবার মতন ক্ষমতা রাখে দেখছি। তার জন্য আপনার ভক্তকবি রামপ্রসাদকে কিভাবে সাধুবাদ জানাব, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না মহারাজ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়গুণাকরের কথাতে একটা অতি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, সত্যিই খুঁজে পাবে না রায়গুণাকর। কারণ, আমার আদেশে আর অন্নদায়িনী 'অন্নদার' কৃপায় 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করলেও জগন্মাতা 'কালী তারার' গানে আত্মহারা ভক্ত সাধককে সাধুবাদ জানাবার মতন 'ভাষা' তুমি খুঁজে পাবে না ত রায়গুণাকর। বলেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষণকাল নীরব থেকে পুনশ্চ বললেন, রামপ্রসাদকে সাধুবাদ জানাতে গেলে চাই আশক্তিবিহীন শুদ্ধ ভালবাসা। আর এই একমাত্র শুদ্ধ ভালবাসা দিয়ে তাঁকে সাধুবাদ জানানো যেতে পারে রায়গুণাকর।

মহারাজের এই উক্তিতে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র মনে মনে ক্রোধভাব পোষণ করলেন। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে, ধীর অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন, তা' হয় তো সম্ভব মহারাজ। কিন্তু ভাবছি সেই সৌভাগ্যের দীপটিকা আমার মতন ইতর জনার ভাগ্যে ঘটবে কিনা।

রায়গুণাকরের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই, সভাপণ্ডিত হঠাৎ সাধুবাদ জানিয়ে বলে উঠলেন, সাধু! সাধু! মহারাজ, আপনার সভাকবি রায়গুণাকর সঠিক কথাই বলেছেন। মহামায়ার চেলাদের সাধুবাদ জানানো সহজ সাধ্য নয়। কথায় বলে, কালীর চেলা সমুদ্রেতে ভেলার সামীল।

সভাপণ্ডিতের অযাচিত উক্তিতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভ্রূকুটি করলেন, সভাস্থ সভাসদেরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু সকলের সেই স্তম্ভিত ভাবকে উপেক্ষা করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন, তা'বটে। আমার সভাপণ্ডিতের এই উক্তিটা যেন 'পদ্মপাতায়' জলের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ভাবতে পারছিনা যে, পাণ্ডিত্যাভিমানী সভাপণ্ডিতের কণ্ঠ থেকে এমন ঈর্ষাপরায়ণ উক্তি নিঃসারিত হ'তে পারে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাতেই সভাপণ্ডিত যেন একেবারে নির্বাক হয়ে যান। এমন কি 'দ্বিতীয় কোন কথা বলতেও যেন আর সাহসী হলেন না।

সভাপণ্ডিতকে মহারাজা সাহাস্যে বললেন, আমার সভাপণ্ডিতের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। যাক, আজ থেকে পণ্ডিত বিদায়ের বরাদ্দটা কিঞ্চিৎ পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলো, এই সুবুদ্ধির জন্য।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে সভাপণ্ডিত যেন আরো ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন। কারণ যাঁর দয়া পরবশতা, মুক্ত হস্তে দান দাক্ষিণ্যতার অন্ত নেই তাঁকে ঘাটানো কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ত'ছাড়া রামপ্রসাদ নামক ব্যক্তিটা কে? কেন মহারাজ সমাদর করেন? কোন গুণের জন্য তাঁকে আপন স্নেহালিঙ্গনে বাঁধতে চান, তার পুঙ্খানু-পুঙ্খ বিচার না করে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা তার পক্ষে বাচালতার সামিল. অতএব এই ক্ষেত্রে নীরব থাকা এবং মহারাজের ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করা ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। নিজের মনে কথাগুলি ভেবে সভাপণ্ডিত একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

সভাপণ্ডিতকে এ ভাবে নিশ্চুপ হয়ে যেতে দেখে, সভাকবি রায়গুণাকর একটু ইতঃস্তত করে বললেন, মহারাজ, সভা-পণ্ডিতকে এ ভাবে সকলের সামনে, 'অজ্ঞাত কুলশীল' রামপ্রসাদের জন্য হেয় করে তোলা কি মহারাজের সমীচীন হয়েছে? বলেই তিনি একটু খানি নীরব থেকে আবার বললেন কে এই রামপ্রসাদ কি বা তার পরিচয়, তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করবার সুযোগ

না দিয়ে তাকে এত সম্মান ও সমাদর দেখানো কি মহারাজের সমীচীন হয়েছে। মহারাজের এই দীন সভাকবিও অন্নদার স্বপ্নাদেশে, মহামায়া মহাশক্তি অন্নদায়িনী অন্নাদার জীবনাখ্যান গীত করেছেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কথাতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ধীর অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন, রায়গুণাকর, মহামায়া মহাশক্তি অন্নদায়িনী অন্নদার জীবনাখ্যান রচনা করে যে অমৃতের সন্ধান করতে পারনি, রামপ্রসাদ সেই অমৃতের সন্ধান করে ফিরছে। তা'ছাড়া তুমি বুঝবেনা এবং জান্‌তে পারবেনা, রামপ্রসাদ কোন 'জহর'। একমাত্র পাকা জহুরীই এই 'জহর'কে চিন্‌তে পারবে।

—তা' বটে! তা' বটে! বললেন রায়গুণাকর। আপনার এই 'জহর'কে দিয়ে একখানা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করিয়ে নেন না কেন। সে কি একখানা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করে মহারাজকে উপহার দিতে পারে না।

রায়গুণাকরের কথা শুনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে, এই আত্মভোলা মাতৃসাধককে দিয়ে 'বিদ্যা আর সুন্দরের' প্রেমোপাখ্যান রচনা করিয়ে তার নির্মল চরিত্রের উপর কলঙ্কের রেখা আরোপ করার জন্য এই কূটনীতি অবলম্বন করেছেন রায়গুণাকর। তাই নিজেকে সংযত রেখে, গাম্ভীর্য পূর্ণ স্বরে বললেন, বেশ, রায়গুণাকর তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। আমি রামপ্রসাদকে সেই আদেশই করবো। মহামায়া মহাশক্তি তারা মা ইচ্ছা করলে রামপ্রসাদ আমার 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য একখানা রচনা করে দিতে পারবে। যদি সে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করে দেয়, তার বিচারের ভার কিন্তু তোমার উপর থাকবে।

—মহারাজের এই আদেশ শিরোধার্য। বললেন রায়গুণাকর।

রায়গুণাকরের কথায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলে নীরবে ভাবতে লাগলেন, সমাজের স্বার্থান্বেষী লোকেরা, স্বার্থে ঘা লাগলে কেমন করে উন্মাদ হয়ে ওঠে। আর ভাবলেন, নিজের

স্বার্থে ঘা পড়লে এবং স্বার্থহানি হতে দেখলে কেমন করে মানুষ নীচতা অবলম্বন করতে পারে।

যাঁকে নিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় উত্তেজনা বা স্বার্থের হানাহানি, হিংসা দ্বেষের প্রাবল্য, সেই রামপ্রসাদ আত্মসমাহিত ভাবে একমাত্র 'মহামায়ার' অপরূপ রূপমাধুরীই দর্শন করে চলেছেন। লীলাময়ীর লীলাখেলা দর্শন করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে রইলেন। সংসারী স্বার্থান্বেষী পরশ্রীকাতরের কথায় তাঁর মতন মানুষের মন আকৃষ্ট হয়নি। তারা মায়ের চরণাশ্রয়ে সমর্পিত তাঁর জীবন মনকে কখনো সংসারের ভোগের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারে কি।

প্রাচীন কালের মুনি ঋষিরা বলেছেন, 'আত্মশুদ্ধি আর মনঃশুদ্ধি কর।' আত্মশুদ্ধি আর মনঃশুদ্ধি হলেই আত্মদর্শন হবে। আত্মদর্শন মানে ঈশ্বর দর্শন ঈশ্বর দর্শন অর্থাৎ মহামায়া মহাশক্তি তারামায়ের মাতৃরূপ দর্শন করতে পারবে।

সর্ব জীবের মধ্যে, সর্ব বস্তুর মধ্যে জগৎ মাতা সারময়ী হয়ে রয়েছেন। আর সেই কারণ বশতঃ জগৎ পিতা সেই সারময়ীর পদতলে শব হয়ে পড়ে রয়েছেন। কারণ ব্রহ্মময়ী তারা মা, জগৎ সংসারকে পরিত্রাণ করতে চান। আবার কাউকে ভোগ বাসনা কামনার পাবক শিখার মধ্যে নিমজ্জিত করেন, আবার কাউকে বা আপনার কোলে তুলে নিয়ে ভক্তির পথ, মুক্তির পথ দেখান।

রামপ্রসাদও সেই ভক্তির পথ আর মুক্তির পথের সন্ধান পেয়ে আত্মসমাহিত ভাবে মুক্তকেশীর নাম গানে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন ব্রহ্মময়ী তারা মায়ের ষোড়শ কিংবা শত সহস্র রূপ মহিমা দর্শন করে। আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করতে করতে, আত্মসমাহিত ভাবে গেয়ে ওঠেন,—

"মন কেন তোর ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলি না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি মন তাই জান না।
কোন্ লাজে তাঁর মাটির মূর্তি গড়িয়ে করিস্ উপাসনা।

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছারডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,
আলোচাল আর বুট-ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না।
কেমনে দিতে চাস্ তুই বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥"

আত্মসমাহিত ভাবে রামপ্রসাদ গেয়ে চলেন মাতৃনাম গান। করতে থাকেন জগৎ মাতার মহিমা কীর্তন। আর তাঁর কণ্ঠের মহামায়া মহাশক্তি স্বরূপীণী তারা মা'য়ের নামামৃতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা আবার যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন সভাসদেরা।

আসক্তিবিহীন মুক্ত বিহঙ্গের মতন যাঁর মন, একমাত্র জগৎ মাতার চরণাশ্রয় পাবার জন্য আত্মহারা হয়ে উঠেছে, তার উপর দোষারোপ করা কতবড় গর্হিত কাজ তা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগলেন।

এমনি এক ভাব গাম্ভীর্যের ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর রামপ্রসাদ ভাবসমাধি থেকে ফিরে এলেন। পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দিকে। এবং প্রশান্তস্বরে বললেন, এবার বিদায় দিন, মহারাজ।

সে কি রামপ্রসাদ! আজই কেন তুমি বিদায় প্রার্থনা করছ? সবিস্ময়ে বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। অন্তত আর দুটোদিন থেকে আমার প্রজাদের আনন্দ দান করে যাও।

বিনীতভাবে রামপ্রসাদ বললেন, মহারাজ আপনার প্রজাদের আনন্দ দান করবার মতন আমার শক্তিই বা কৈ! একমাত্র জগৎমাতার ইচ্ছা ভিন্ন, আমার কোন কিছু করবার শক্তিই নেই মহারাজ! বলে একটুখানি নীরব থেকে পুনশ্চ বললেন, মহারাজা, আমার জগৎমাতার যদি ইচ্ছা হয় তবে আপনার এই

আদেশ এবং আপনার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। রামপ্রসাদের কথা শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, রামপ্রসাদ! মা আমার এই আশা অপূর্ণ রাখবেন না।

রামপ্রসাদ এ'কথার দ্বিতীয় কোন উত্তর না দিয়ে শুধু নীরবে সম্মতি জানালেন।

এমনি ভাবে আরো বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এক সময় রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বিদায় প্রার্থনা জানালেন।

রামপ্রসাদকে বিদায় প্রার্থনা জানাতে দেখে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, জানি রামপ্রসাদ, তোমাকে আর দু'দিন বেঁধে রাখবার মতন শক্তি আমার নেই। তবু বলি, একান্তই যখন তুমি তোমার জন্মভূমিতে ফিরে যেতে চাইছ, যাও। তোমাকে আর বাধা দেব না।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় রামপ্রসাদ সানন্দে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আবাব সুদীর্ঘ পথের মাঝে নেমে পড়লেন। পথে নেমেই সদানন্দময় আত্মভোলা রামপ্রসাদ মাতৃনাম গান করতে করতে পথ চলতে লাগলেন।

"কালী গো কেন লেংটা ফের।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ॥
বসন-ভূষণ নাই তোমাব মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো, এই কি তোমার কুলের ধর্ম, পতির উপর চরণ ধর ॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মাগো, আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর ॥
ত্যজি রত্নহার মা, তোমার ও কণ্ঠে শোভে নরশির।
প্রসাদ বলে ঐ রূপে মা ভয় পেয়েছেন দিগম্বর ॥"

রামপ্রসাদের কণ্ঠে মাতৃনাম গানের সেই মোহনিয়া সুরধ্বনি, ক্রমে দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু—সেই মোহনিয়া সুরের রেশ কৃষ্ণনগরবাসীদের সকলের হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে বার বার জাগিয়ে তুলতে লাগল।

॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এলেন রামপ্রসাদ।

ফিরে এলেন নিজের জন্মভূমি হালিশহরে। ফিরে এলেন মনের মধ্যে অনন্ত ভাবনা নিয়ে।

এই অনন্ত ভাবনা বার বার উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলতে লাগল, সত্যনিষ্ঠ রামপ্রসাদের মনকে। এই অনন্ত ভাবনারাশীর যেন শেষ নেই। এই ভাবনার মূলকে উৎপাটিত করে ফেলবার মতন পথ নেই।

সব পথই যেন মহামায়া, মহাশক্তি তারা মা-ই বন্ধ করে দিয়ে ভাবনার সমুদ্রের স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই ভাবনার সমুদ্রের স্রোত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার মতন শক্তিও বুঝি আজ তাঁর রহিত হয়ে গেছে। এমন কি মহামায়া মহাশক্তির নাম গান পর্যন্ত, আজ তাঁর কণ্ঠে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু একমাত্র ভাবনা কি করে সত্যনিষ্ঠ রামপ্রসাদ তাঁর সত্য রক্ষা করবেন। কঠিন কঠোর সত্যটাকে সফলতার রূপ দেওয়া যে কত বড় কঠিন তা' আজ এই মুহূর্তে অনুভব করতে লাগলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কথা দিয়েছেন; কথা দিয়েছেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করে দেবেন। অথচ বিদ্যা আর সুন্দরের এই প্রেমোপাখ্যান কি ভাবে রচনা করবেন তা' ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

যতই ভাবেন ততই যেন সমস্যার পর সমস্যা এসে সমস্তই তালগোল পাকিয়ে দেয়। অথচ সমস্যা সমাধানের কোন পথই তাঁর চোখের সামনে উন্মুক্ত হয় না। সবই যেন একাকার হয়ে যায়।

তাঁর সমস্ত অন্তরটা যেন একটা কান্নার আবেগে আকুলিবিকুলি করতে থাকে,—মাগো, তোর অভাগা সন্তান আজ কি সত্য ভঙ্গ করে মিথ্যাচারী হয়ে যাবে?

রামপ্রসাদের মনের মধ্যে যখন এমনি এক আর্তি ভাব জেগে ওঠে,

তখনই বুঝি 'মা' অলক্ষ্যে বসে হাসেন। হাসলেন—তা' কি করে হয় রে? সন্তানের মনের মধ্যে এমনি এক আর্তিভাব না জাগা পর্যন্ত তা'কে দিয়ে কোন কাজেই যে সফলতা আনানো যায় না। তাই ত তোর মনের মধ্যে আর্তিভাব জাগানোর জন্যই আমার এই লীলাখেলা।

যখন রামপ্রসাদ এমনি এক উন্মাদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন, ঠিক সেই মুহূর্তক্ষণে বুঝি জগৎ জননী তারা মা সর্বাণীদেবীকে দিয়ে বলালেন, দেব, আপনাকে ক'দিন ধরে এত চিন্তিত দেখছি কেন? এমন কি ঘটনা ঘটলো যে, মায়ের নামগান পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল।

সর্বাণীদেবীর কথা শুনে রামপ্রসাদ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, দেবী, এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে, তারা মা-ই আমাকে বড় চিন্তিত করে তুলেছেন।

—দেব! এই দীনহীনা অভাগী আপনার সেবার অযোগ্যা। তবু, জানতে ইচ্ছা করে জগন্মাতা তারা মা কেন আপনাকে এমন চিন্তিত করে তুলেছেন। যার জন্য তাঁর নামগান পর্যন্ত আপনার কণ্ঠ থেকে আর শোনা যায় না। যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আমাকে বুঝিয়ে দিন।

সর্বাণীদেবীর কথা শুনে রামপ্রসাদ ক্ষণকাল·ভাবলেন। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে, ধীর কণ্ঠে বললেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশের কথা। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করে দেবার কথা।

স্বামীর এমন চিন্তিত হবার কারণ জানতে পেরে সর্বাণীদেবী তখন ধীর অথচ প্রশান্ত স্বরে বললেন, দেব! আপনাকে কিছু বলবার মতন 'শক্তি' আমার নেই। তবুও মনে হয় যিনি আপনার সম্মুখে এই সমস্যা তুলে ধরেছেন, তিনিই এই সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

—কিন্তু, কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে, আর কি ভাবে যে সত্যরক্ষা করতে পারব, তা বুঝে উঠতে পারছি না। —বললেন রামপ্রসাদ।

সর্বাণীদেবী পুনশ্চ বললেন, আপনি তার জন্য চিন্তা করবেন না। কল্য থেকে এই কাব্য রচনা আরম্ভ করুন। তারা মা-ই আপনার সকল সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

সর্বাণীদেবীর কণ্ঠ থেকে এমন অভয় বাণী শুনে রামপ্রসাদ মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করলেন। এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, তার পরের দিন থেকে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা আরম্ভ করবেন বলে।

* * *

প্রভাতী স্নিগ্ধ আলোকরেখা তখন সমস্ত পৃথিবীটাকে পরিব্যপ্ত করে দিয়ে, একটা উচ্ছল আনন্দের বন্যা যেন সকলের মনের মাঝে জাগিয়ে তুলেছে। রামপ্রসাদ প্রভাতী আলোর ঝর্ণাধারা ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ভাগীরথীর তীরে এসেই অবগাহনের জন্য ভাগীরথীর গর্ভে নেমে পড়ে, জয় কালী জয় কালী বলতে বলতে ডুব দিলেন,—তারপর উদাত্ত স্বরে মাতৃনামগান করে উঠলেন—

"ডুব দেরে মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥"

মাতৃনামগান করতে করতে রামপ্রসাদ অবগাহন সমাপ্ত করে উঠে পড়লেন এবং উঠে পড়েই স্ব-গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

রামপ্রসাদ অল্পক্ষণ পথ চলার পরেই স্ব-গৃহে ফিরে এলেন। ফিরে এসেই জগন্মাতার ধ্যান-পূজা, জপ-তপ করতে লাগলেন।

জগন্মাতার ধ্যান-পূজা, জপ-তপ সমাপ্ত করে রামপ্রসাদ একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন স্বগৃহের দাওয়ার উপর। ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বাণী দেবী এসে দাঁড়ালেন তাঁরই কাছে।

পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে রামপ্রসাদ প্রশান্ত দৃষ্টি তুলে তাকালেন স্ত্রীর মুখের দিকে।

তাঁকে প্রশান্ত দৃষ্টি তুলে তাকাতে দেখে, সর্বাণীদেবী বললেন, আজ আপনার কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করবেন না?

—হাঁ। আজ থেকেই আরম্ভ করবো। তুমি ভূর্জপত্র আর লেখনী এনে দাও। রামপ্রসাদ বললেন।

স্বামীর আদেশে সর্বাণীদেবী কিছু ভূর্জপত্র আর লেখনী অল্প সময়ের মধ্যে নিয়ে এসে ঘরের দাওয়াতে স্বযত্নে সাজিয়ে রেখে একটা আসন পেতে দিলেন রামপ্রসাদের বসবার জন্য।

সর্বাণীদেবী আসন পেতে দিলে, রামপ্রসাদ তাতে উপবেশন করে, জগৎ মাতার নাম স্মরণ করে তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করতে বসে প্রথমেই বন্দনা করলেন, সিদ্ধিদাতা গণেশের তারপর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, ভাগ্য রূপিণী লক্ষ্মীর বন্দনা করলেন। কিন্তু তাঁদের সকলের বন্দনা করে তিনি মনের মধ্যে যেন কোনরূপ শান্তি পেলেন না। যেন, আরো কিছু করবার আছে তা করা হয় নি

ভাবতে লাগলেন রামপ্রসাদ।

তখন বসন্তের একটা মৃদু বাতাস, গাছের পাতাগুলিকে যেন কল্লোলিত করে তুলছিল। আর সেই হিল্লোলকে চির জাগরিত করে, গাছের পাতাগুলি বিদায়ের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে যখন খসে খসে পড়ছিল, ঠিক সেই সময়ে রামপ্রসাদের মনে পড়ল জগন্মাতা কালীর বন্দনা করা ত হয় নি!

তখন তিনি লেখনী ধারণ করে কালী মাতার বন্দনা লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথমেই তিনি লিখলেন—

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালীনাম।
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্য ধাম॥
কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়্গা বটে সেই॥

আপন ভাবাবেগে রামপ্রসাদ মায়ের বন্দনা লিখে চললেন। লিখে চললেন আত্মসমাহিত ভাবে। এই আত্মসমাহিত ভাবের মধ্যে প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্য, রূপ আলো বাতাস বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে, সবই যেন

কালীময় হয়ে গেছে। যেন মহামায়া মহাশক্তি মহাকালীই বাস্তব রূপ নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়িয়েছেন লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী রূপে।

কলিকালের যত কালির আবর্জনা আছে তা সবলে মুক্ত করবার জন্য দিগ্‌বসনা রূপে তাঁর এই অপরূপ রূপ দর্শন করতে করতে রামপ্রসাদ বন্দনা করে চললেন—

কাদম্বিনী জিনিয়া নির্মল বর্ণ কালো।
কলেবর-কিরণ তিমির-পুঞ্জ আলো॥
কটিতটে করালী লম্বিত মুণ্ডমাল;
লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল॥
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পবান।
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয়দান॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণযুগলে।
বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে॥

মহামায়া 'মহাকালীর' সেই অপরূপ রূপ মাধুরী দর্শন করতে করতে রামপ্রসাদ আত্মহারা হয়ে গেলেন। যাঁর পদতলে শত সহস্র, কোটি কোটি গ্রহ-তারা বিরাজিত হয়ে রয়েছে, যাঁর চরণ বন্দনা করবার জন্য সমস্ত দেবতারা উন্মুখ হয়ে থাকেন সদা সর্বদা, রামপ্রসাদ সেই রূপ দর্শন করে তাঁরই বন্দনা করতে করতে আত্মহারা না হয়ে পারেন কি?

যাঁর পদতলে সদাশিব, শবরূপী হয়ে শ্মশানবাসী হয়েছেন যাঁর চরণ-যুগল আপন বক্ষে ধারণ করে, শিব মহাজ্ঞানী হয়েছেন। জগন্মাতা মহাকালীর ভক্ত সন্তানেরা অর্থাৎ মুনি-ঋষি যোগী, সাধু তপস্বীরা বলেছেন—

"না বুঝি মহিমা তোমার।
না জানি ভকতি স্তুতি;
অনন্ত বীর্যশালীনি মহামায়া
মহাশক্তি মহাকালী।

অপার মহিমা তোমার
বোঝা বড় ভার ;
অপার, অপার।"

মহামায়া মহাকালীর সেই শত সহস্র রূপমাধুরী পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করা সহজসাধ্য নয়। কেন না তিনি জলে-স্থলে অন্তরীক্ষ্যে বিরাজিতা। কখন কি রূপে মা যে প্রকাশিতা হন, তা বলা দুষ্কর। তাই ত প্রাজ্ঞ শাস্ত্রকারগণও বলেছেন 'শত সহস্রাণী রূপাণি' বলে। রামপ্রসাদ মায়ের শত সহস্র রূপ দর্শন করতে বলেছেন।

এই শত সহস্ররূপ রামপ্রসাদ নিজেও দর্শন করেন। দর্শন করেন অনন্ত বীর্যশালিনী মহামায়া মহাশক্তিকে। সেই শক্তিরূপীনির ধ্যান জপ-তপ করে: সেই শক্তিরূপীনি মহামায়ার নামগান করে আজ কেমন করে 'বিদ্যা-সুন্দর' কাব্য রচনা করবেন! বিদ্যা-সুন্দর আর মালিনীর প্রেমাখ্যান বর্ণনা করবেন?

অনন্ত ভাবনায় যখন রামপ্রসাদ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতে লাগলেন তখনই বুঝি মহামায়া মহাশক্তি 'তারা মা' অলক্ষ্যে বসে হাসলেন। হাসলেন—ওরে আমার পাগল ছেলে, তুই অত ভাবছিস কেন? তোর কি জানা নেই, সর্বভূতে আমি যে বিরাজিতা। স্ব-গুণে-নির্গুণে জ্ঞানে-অজ্ঞানে, স্থাবর-জঙ্গমে, আর সাকারে কিংবা নিরাকারে আমিই বর্তমান। প্রেমের মধ্যেও আমি, অপ্রেমের মধ্যেও আমি। আমি যা' করাবো কলির প্রতিটি জীবকে তাই করতে হবে।

তাইত বুঝি সর্বাণীদেবীর ভিতর দিয়ে এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। আর সেই প্রেরণায় রামপ্রসাদ তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করে চললেন। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, একনিষ্ঠ ভাবে।

রামপ্রসাদ এই বিদ্যা সুন্দর কাব্য রচনাকরা কালে এক স্থানে বলেছেন—

"কালাকিঙ্করের কাব্য কথা বোঝা ভার।
সে বুঝে অক্ষর—কালী হৃদে আছে যার॥"

বস্তুত, এই যে রামপ্রসাদ, তাঁর এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য গ্রন্থের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিকতার যে ভাব পরিপূর্ণ করে তুলেছেন প্রতি ছত্রে ছত্রে, বিশেষতঃ জগন্মাতার মহিমা কীর্ত্তন আর জগন্মাতার নাম গানের মাধ্যমে একদিন এই কাব্যগ্রন্থ সমাপ্ত করেছিলেন।

॥ ২৫ ॥

রামপ্রসাদ তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য সমাপ্ত করে, যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন একটা অনন্ত বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। এই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে রামপ্রসাদ গেয়ে উঠলেন মাতৃনাম গান—

"ডাকরে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুল না মন সময়কালে ॥
এসব ঐশ্বর্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ।
ওরে ও পদপঙ্কজে মজ, চতুর্বর্গ পাবে হেলে ॥"

সেই অনন্তরূপিনী মহামায়া মহাশক্তি 'তারা মায়ের' নাম গানে আত্মহারা হয়ে উঠলেন রামপ্রসাদ। আত্মহারা হয়ে গাইলেন একমাত্র কালী তারা ব্রহ্মময়ীর অপার মহিমা-গান।

যাঁর নাম গানে মরা বাঁচে, যাঁর নাম গানে অসাধ্য সাধন হয়। সেই মাতৃনাম গানে মাতোয়ারা না হয়ে পারেন কৈ? রামপ্রসাদ তাঁর অসাধ্য কাজকে সাধ্য করতে পারায়; তার সত্যনিষ্ঠতাকে রক্ষা করতে পারাতেই রামপ্রসাদের সমস্ত ভাবনা চিন্তার কালো মেঘ বিদূরিত হয়ে গেল এবং তিনি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন।

তাঁর এই আনন্দ ও আত্মহারা ভাব দীর্ঘ দিনের জন্য স্থায়ী হতে পারল না।

কারণ যাঁর আদেশে এই মহান গ্রন্থ রচনা; যাঁর কৃপাবলে তাকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেওয়া; আর যে নিষ্ঠা আর একাগ্রতার প্রকাশ

তাঁকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত করতে হবে। তা' না হলে তমসাবৃত অজ্ঞানী ও দাম্ভিকদের চোখ খুলবেই বা কি করে। তমসার কালো অন্ধকার দূরীভূত করতে হবে।

তাঁর সকল ভাবনাকে ওলট-পালট করে দিয়ে মহামায়া মহাশক্তি তারা মা-ই আদেশ করলেন—আগামী কৃষ্ণপক্ষেই তুই যাত্রা কর। 'কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে তোর 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' রাজার হাতে অর্পণ করবি।

মায়ের এই আদেশকে রামপ্রসাদ সাদরে গ্রহণ করলেন। ইচ্ছাময়ী তারা মাগো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে মা!

॥ ২৬ ॥

সাধক কবি রামপ্রসাদ মায়ের এই আদেশে যাত্রা শুরু করলেন।

আত্মভোলা রামপ্রসাদ পথ চলেছেন। চলেছেন কৃষ্ণনগরের দিকে। সঙ্গে রয়েছে স্ব-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যখানি। যাঁর আদেশে এই অমূল্য সম্পদখানি রচনা করেছেন, মহামায়া মহাশক্তির কৃপায় তা' আজ তুলে দিতে চলেছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে।

পদব্রজে চলেছেন অভয়ার অভয় নামগান করতে করতে--

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দি মা
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্মচারী॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা।
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারী॥"

আদ্যাশক্তি মহামায়ার নাম গানে মাতোয়ারা হয়ে বিপদ সঙ্কুল

পথে এগিয়ে চলেছেন রামপ্রসাদ। পথ চলেছেন দিবা-রাত্রি। কত দস্যু-তস্কর আর নরহন্তাকারীদের মধ্য দিয়ে, আত্মসমাহিতভাবে। আদ্যাশক্তি মহামায়ার নামগান করতে করতে।

আর কণ্ঠের এই মাতৃনামের গুণে সব দস্যু তস্করেরা দূরে সরে গিয়ে বিস্ময় ভরা চোখ দু'টি তুলে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে এই আত্মভোলা সাধক কবির দিকে।

কিন্তু রামপ্রসাদের সমস্ত দেহ-মন এক পরিপূর্ণ দিব্য-ভাবে সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কে নরহন্তাকারী আর কেই বা দস্যু তস্কর তা দেখবারও যেন অবসর নেই। একমাত্র মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলেছেন। কণ্ঠে এক মাত্র তাঁরই নাম গান—

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব।।
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে প'ড়ে রব।।
প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
আমার দুই বাহু পসারিয়ে চরণতলে প'ড়ে প্রাণ ত্যাজিব।।"

এমনি এক আর্তিভাব নিয়ে, আপন খেয়ালে পথ চলেন রামপ্রসাদ।

দিবা-রাত্রি একটানা পথ চলে অবশেষে রামপ্রসাদ এসে পৌঁছালেন কৃষ্ণনগরে। কণ্ঠে তাঁর একমাত্র মাতৃনামগান। জীবন-মনকে আত্মসমাহিত করে রেখে, কালী তারার নামগান করতে করতে এগিয়ে চলেন রাজপ্রাসাদের দিকে।

বাতায়ন মুক্ত করে দেখেন পুরনারীগণ। আর পথিকেরা অবাক্ নয়ন তুলে তাকিয়ে থাকেন আত্মভোলা রামপ্রসাদের মুখের দিকে।

বৃদ্ধরা আপন আপন মাথা দোলাতে দোলাতে বলে ওঠেন, মহারাজার সভা অলঙ্কৃত করবার জন্য আবার ফিরে এলেন মাতৃসাধক রামপ্রসাদ।

যারা জানে না, তারা শুধায়, কে ঐ রামপ্রসাদ ?

—ওঃ ! তুমি জান না বুঝি ? এ হচ্ছে সাধক কবি। শুনেছি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এঁকে আবিষ্কার করেছেন, তাঁরই রাজ্যের মধ্যে, হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রাম থেকে।

মহামায়া মহাশক্তির অশেষ কৃপার দান বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি। যা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের প্ররোচনায়, তাঁকে রচনা করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আর তারই জন্য আজ আবার তাঁকে এই কৃষ্ণনগরে ছুটে আসতে হয়েছে।

আসতে হয়েছে, ইচ্ছাময়ী তারা মা'য়ের ইচ্ছায়।

রামপ্রসাদ তাই মনের সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে একমাত্র রঙ্গময়ীর নানা রঙ্গের কথা, আপন গানের সুরে বেঁধে গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেন রাজপ্রাসাদের দিকে।

॥ ২৭ ॥

সাধক রামপ্রসাদ সমস্ত দিবস পথ চলার পর অবশেষে অপরাহ্নের শেষে এসে দাঁড়ালেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ প্রাসাদের সামনে। অভয়ার নামগানের উন্মাদনায় তিনি আত্মহারা হয়ে রয়েছেন। তিনি গাইছেন—

"এমন দিন কি হবে তারা !
যবে তারা তারা তারা বলে বেয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা ॥"

রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বরে, তখন অপরাহ্নের সমস্ত আকাশ বাতাস বার বার প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। প্রকম্পিত হয়ে ওঠে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমস্ত রাজ প্রাসাদটি। যেন, কোন এক অদৃশ্য ইন্দ্রজালিক শক্তি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেহ মনকে একটা উন্মাদ ভাবে বার বার কম্পিত করে তুলতে লাগল।

তিনি সেই উন্মাদনায়, সেই আবেগানুভূতিতে বলে উঠলেন, ওরে তোরা কে আছিস, এক্ষুনি ছুটে যা। ঐ গায়ককে সাদরে আমার কাছে নিয়ে আয়।

মহারাজার আদেশে ভৃত্যরা ছুটে আসে রামপ্রসাদের সামনে। এবং এসেই তারা দেখে সাধক আত্মহারা হয়ে রয়েছেন।

আত্মহারা রামপ্রসাদের দু'নয়ন হতে, বিগলিত অশ্রুধারা বইতে থাকে। বন্ধনহীন জলধারা যেমন ভাবে বয়ে চলে, তেমনি ভাবে বইতে থাকে রামপ্রসাদের দু'নয়ন থেকে।

একটা আবেগ বিহ্বলতা যেন রামপ্রসাদের সুস্থ দেহ-মনকে আত্মসমাহিত ভাবে পরিণত করেছে। যেন তাঁর মন-প্রাণটা কোন এক অলৌকিক শক্তির সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। অচঞ্চল, অকম্পিত তাঁর সমস্ত দেহমণ্ডলী।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভৃত্যদ্বয় এসেই তাঁকে প্রথমে কোন কথা জানাতে সাহস পায়নি। আর পাবেই বা কি করে? যে শক্তির প্রভাবে সমস্ত জগৎ সংসার স্তব্ধ হয়ে থাকে সেই শক্তির প্রভাবেই মহারাজের ভৃত্যদ্বয় স্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

এই ভাবে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পর রামপ্রসাদের আবার সম্বিত ফিরে এলো। তিনি 'জয় মা তারা' বলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। সাধকের কণ্ঠের তারা নামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভৃত্যদ্বয়ের নির্বাক ভাব কেটে যায়। তারা তাড়াতাড়ি হাত দুটি জোড় করে বলল, বাবা, মহারাজ আপনার দর্শন পাবার জন্য অপেক্ষা করছেন! আপনি অনুগ্রহ করে, আমাদের সঙ্গে রাজ প্রাসাদে আসুন!

তাদের কথায় রামপ্রসাদ বললেন, বেশ চল। মহারাজার জন্য আমার মনটাও বড় উতলা হয়ে উঠেছে। তাঁর সত্বর দর্শন লাভ না করলে, জগন্মাতা আমার মনকে শান্ত করবেন না। রামপ্রসাদের কথা শুনে ভৃত্যদ্বয় 'আসুন' বলে পথ দেখিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল।

রামপ্রসাদ তাদের পথানুসরণ করে এগিয়ে চললেন। পথ এগিয়ে চললেন জগৎ জননীর নামগান করতে করতে—

'সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা মাগো,'

রামপ্রসাদকে সঙ্গে করে মহারাজের ভৃত্যদ্বয় যখন রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলো, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমস্ত রাজপ্রসাদ জুড়ে নেমে এসেছে। জ্বলে উঠেছে সন্ধ্যার দীপমালা। জেগে উঠেছে সন্ধ্যার শ্যামাগীত। অদূরে কোন দেব মন্দিরে সান্ধ্যারতির আয়োজন সুরু করবার পূর্বেই ওঁমকার ধ্বনি তুলে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছেন, দেব দেবীর সেবায়ত।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ততক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন রামপ্রসাদের জন্য। ভৃত্যদ্বয়ের সঙ্গে তাঁকে প্রবেশ করতে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন সাধককে।

শুধু অভ্যর্থনা নয়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে রামপ্রসাদকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, রামপ্রসাদ আবার যে তোমার সত্বর দেখা পাব, এটা আমার মোটেই আশা ছিল না। কিন্তু, দেখ মহামায়ার কি অপূর্ব খেলা। অল্পদিনের মধ্যে আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিল।

রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে, ধীর অথচ প্রশান্ত স্বরে বললেন, মহারাজা, ইচ্ছাময়ী তারা মা যখন যা ইচ্ছা করেন, তখন তাই হয়। তাঁর ইচ্ছায় বিশ্বসংসার ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। জগন্মাতার অসাধ্য কোন কিছু আছে কি মহারাজ?

রামপ্রসাদ থামতেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, তা' ঠিক কথা রামপ্রসাদ! জগৎমাতার অসাধ্য এ বিশ্ব সংসারে কিছুই নেই। তবে কি জান, সংসারে আমরা মায়ান্ধ জীব! মায়ায় বশীভূত হয়ে, আমরা আপন আপন সত্তাকে পর্যন্ত ভুলে যাই, ভুলে যাই সংসারে আমাদের কিসের জন্য পাঠিয়েছেন

জগৎমাতা, সংসারে আমরা কোন কার্য সিদ্ধি করতে এসেছি! কিন্তু, যাক্ সে কথা, তুমি পথশ্রান্ত। আজ তুমি বিশ্রাম কর। আগামী কাল তোমার কথা শুন্‌ব!

রামপ্রসাদ বললেন, না মহারাজ! মহামায়া মহাশক্তি তারা মায়ের কৃপায় কোনরূপ শ্রান্তি অনুভব করছি না। কিন্তু, আজ যে জন্য সুদূর হালিশহর থেকে আবার আপনার রাজসভায় আসতে হলো তাই বলি।

বাধা দিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, না! রামপ্রসাদ না! আজ তোমার কোন কথা শুন্‌বো না। কাল রাজসভাতে তোমার যা বক্তব্য তা' সকলের সামনে ব্যক্ত করবে। আজ তুমি বিশ্রাম কর। বলেই তিনি হাঁক্ দিলেন, ওরে কে আছিস?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আহ্বানে ভৃত্য এসে কাছে দাঁড়াতেই মহারাজা আদেশ করলেন, রামপ্রসাদের থাক্‌বার জন্য ভাল ব্যবস্থা করে দাও। আর তাঁর সেবাযত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়।

ভৃত্য উত্তর দিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি পূর্বেই সেই ব্যবস্থা করে রেখেছি। পূর্বে আপনার ঘরের পার্শ্বে যে ঘরটি উনার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, এবারও সেই ঘরটি নির্দিষ্ট করে রেখেছি, মহারাজ!

বেশ! —বলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—যাও রামপ্রসাদ। এবার তুমি বিশ্রাম করগে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই আদেশ, রামপ্রসাদ আর অবহেলা করতে পারলেন না। তাই তিনি আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে সেই ভৃত্যের পশ্চাদানুসরণ করলেন।

রামপ্রসাদ প্রস্থান করতেই, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন।

তারপর আপন মনেই বলে উঠলেন, ইচ্ছাময়ী তারা মাগো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

প্রভাতী সূর্যের রক্তিম আভা তখনো ছড়িয়ে পড়েনি। তখনো জেগে ওঠেনি বন্দনারত বিহগদলের কাকলি। শুধু একটা অশান্ত পাপিয়া ক্ষণে ক্ষণে আর্তনাদ করে, তার অশান্ত মনের বিরহ বেদনা জানিয়ে চলেছে।

রামপ্রসাদ সমস্ত রাত্রি ধ্যান-মগ্ন থাকার পর ভোরের ক্ষীণ আলোক-আঁধারীতে, আপনার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়ালেন মায়ের নাম স্মরণ করতে করতে। তারপর বন্ধ দ্বার মুক্ত করে প্রাতঃকৃত্য সমাপণের জন্য সক্রিয় হলেন। এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যে প্রাতঃকৃত্য সমাপণ করে, উদাস উদার কণ্ঠে মাতৃনাম গান করতে লাগলেন—

আর ভুলালে ভুলব না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উলব না গো।
সুখদুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলব না গো॥
ধনলাভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলব না গো।
আশাবায়ুগ্রস্থ হয়ে মনের কথা খুলব না গো॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥"

রামপ্রসাদের কণ্ঠের উদার উদাস করা মাতৃনাম গান, প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে আরো রমণীয় করে তোলে। যেন কৃষ্ণনগরের সকল মানুষের মন-প্রাণকে মাতোয়ারা করে তুলে ভক্তি প্রেমের বন্ধনে বেঁধে ফেলতে চান রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের সেই মনমোহনীয়া গানের সুরে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র 'তারা তারা' বলে শয্যাত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।—উঠে দাঁড়ালেন একটা পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে। পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—পূর্ব দিগন্তের পানে।

পূর্বাশার দিগচক্রবালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপন মনেই বলে উঠলেন—জগৎমাতা, –তারা নামই একমাত্র জগৎ সংসারের সার হয়ে রয়েছে।

এই অমৃতময় সারের তত্ত্ব কয় জনেই বা বুঝতে পারে। আর কয় জনেই বা নিতে পারে।—যে পেরেছে, সেই অমৃতের খনির সন্ধান করতে পেরেছে।—যে পারেনি সে অথৈ জলে তলিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। তাইত শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'সারাং সার' কেবল মাত্র মায়ের মহিমা। মাতৃ মহিমাকে লাভ করতে হলে জগৎ সংসারকে সারময়ী করে তুলতে হবে। ধ্যান জ্ঞান যাগ, যজ্ঞ, পূজা অর্চ্চনা সব কিছুকেই একে অঙ্গীভূত করে নিতে হবে 'সমাধির' গণ্ডীর ভেতরে। তবেই মহিমান্বিত মহামায়ার অপরূপ রূপ মাধুরী দর্শন করতে পারা যাবে।

আপন মনেই কথাগুলি ভাবলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ভাবলেন আর নিজের মনেই পার্থক্য খুঁজতে লাগলেন, সাধক কবি রামপ্রসাদের মধ্যে আর আপন সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মধ্যে—একজন দাম্ভিক, অহংকারী, কূটনীতি পরায়ণ; আর অপর জন, আত্মভোলা, মাতৃভাবে বিভোর।

অবশ্য দুই জনেই দিক্‌পাল, দুই জনেই জ্যোতিষ্ক। অথচ দুই জনেরই 'জ্যোতি' দুই ভিন্ন গতিতে প্রবাহিত।

একজনের জ্যোতি তীক্ষ্ণ খরধার, আর অপরজনের জ্যোতি স্নিগ্ধতা ও শান্তি প্রদান করে। কথাগুলি ভাবতে ভাবতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আপন শয়নকক্ষ ত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করবার জন্য চলে গেলেন।

* * *

প্রভাতী সূর্যের জ্যোতির্ময় আলোকধারা সমস্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। জেগে উঠেছে সমস্ত কৃষ্ণনগরের অধিবাসীরা। রাখালের প্রভাতী বাঁশীর মোহনীয়া সুর লহরী, ভক্ত সংসারীদের কণ্ঠে দেব-দেবীর বন্দনা, পূজারী সেবায়েতের স্বস্তি বচন প্রভৃতি সবকিছু মিলে একটা মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে কৃষ্ণনগর শহরটিতে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে আপন প্রাতঃকৃত্য কর্মাদি সমাপনান্তে দরবারে যাবার আয়োজন করতে লাগলেন। আয়োজন করতে লাগলেন একটা নূতন রূপে। আয়োজন করতে করতে আপনার এক অনুগত ভৃত্যকে ডেকে বললেন, আমি সভায় যাবার পর সাধককে সাদরে রাজসভায় নিয়ে যাবে।

মহারাজের এই আদেশে ভৃত্য নীরবে সম্মতি জানাল।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভৃত্যকে বিদায় দিয়ে আপন মনে ভবলেন, না জানি আজ মহামায়া মহাশক্তি তারা মা কোন খেলা খেলবেন! কথা গুলি নিজের মনে ভাবতে ভাবতে, রামপ্রসাদ মাতৃনাম গানের একটা কলি গুণ্ গুণ্ করে গাইতে লাগলেন, সেকি এম্নি মেয়ের মেয়ে। যাঁর নাম জপিলে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥

আপন মনে গুণ্ গুণ্ করতে করতে কেমন যেন, ভাবে বিভোর হয়ে পড়েন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি যেন একাকার হয়ে যায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে তাঁর সমস্ত ঐহি শক্তি বিলীন হয়ে গিয়ে চোখের সামনে জেগে ওঠে এক অপরূপ দৃশ্য। সামান্য থেকে সামান্যতম গৃহারা, রাজা মহারাজা, নাজির উজিরও কখনো কল্পনা করতে পারে না, সেই অপরূপ দৃশ্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেন প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন, ভক্ত আর ভগবানকে একাত্মরূপে। দেখলেন, সাধক আর মহাশক্তিকে। যেন মহাশক্তি তারা মা আর সাধক কবি একাত্ম হয়ে গেছেন! 'একবার তারা তারা বলে ভাব সমুদ্রে ডুব দেরে মন।'

ক্ষণিকের জন্য ভাবসমুদ্রে ডুব দিয়ে এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলেন। সেই বিহ্বলতার ভাব কেটে উঠতেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে, রাজ-সভার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন।

॥ ২৯ ॥

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা।

সভার চারিপার্শ্বে স্বঃ স্বঃ আসনে উপবিষ্ট হয়ে রয়েছেন সভাসদেরা, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী আর সকলেই। ভাটেরা ফুল-বেলপাতা নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন, মহারাজের আগমনের আশায়। মহারাজা সভায় এলে, তারা স্বস্তি বচন আওড়িয়ে, ঈশ্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করেন। চারণেরা একতারা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন, 'রাজগাথা' কীর্ত্তন করবার জন্য। সভার আর এক পাশে চোখ ফেরালে দেখা যায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নবরত্নের সভাসদেরা নানা বিষয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন। এবং তাদের মধ্যমণি হয়ে রায়গুণাকর, কারো আলোচনাকে সমর্থন করছেন আবার কারো আলোচনার অংশকে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন।

এই সব কিছু মিলিয়ে সমস্ত রাজসভা একটা বৈচিত্র্যময় রূপ ধারণ করেছে। অথচ তার মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি জাগরিত হয়ে সমস্ত সভামণ্ডপটিকে মুখরিত করে তুলছে। ঠিক তেমনি সময়ে দৌবারিক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আগমন-বার্তা ঘোষণা করতে লাগল।

দৌবারিকের বার বার সংবাদ ঘোষণাতে সমস্ত সভাটি নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। সভাস্থ সকলেই একটা স্বতঃ গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব ধারণ করে অপেক্ষা করতে থাকেন মহারাজের আগমনের জন্য।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সভায় প্রবেশ করতেই সকলে স্বঃ স্বঃ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন, ভাটেরা 'স্বস্তি' বচন আওড়াতে আওড়াতে মহারাজকে অভ্যর্থনা জানিয়ে দেবতার পূজার অর্ঘ্য অর্পণ করতে করতে এগিয়ে এলেন। চারণ কবির দল, মহারাজের রাজগাথা কীর্ত্তন করতে লাগলেন।

সকলে আসন গ্রহণ করতেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বতঃ গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন, আজকের সভাকে এক নূতন সভাতে পরিণত করার আয়োজন করেছি। আজ কোন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যার

আলোচনা করা হবে না। কেন না এই সভাকে কেবল মাত্র ধর্ম ও নীতি জ্ঞানের বিচার সভা বলে পরিগণিত হবে। রানীর বরপুত্র অন্নদায়িনী অন্নদার স্বপ্নাদিষ্ট রায়গুণাকর তার বিচার করবেন, বিচার করবেন জগন্মাতা তারাশক্তির অঞ্চলের নিধি সাধক কবি রামপ্রসাদের কাব্য সৃষ্টির।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বিনীত ভাবে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বললেন, মহারাজা! আজকের সভাকে বিচার সভায় পরিণত করবার অভিপ্রায় বুঝতে পারলাম; কিন্তু এটা বুঝতে পারলাম না যে মাতৃনাম গায়ক রামপ্রসাদ আবার কোন্ কাব্য সৃষ্টি করলো?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়গুণাকরের কথা শুনে সহাস্যে বললেন, সেকি রায়গুণাকর! তুমি কি সে কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে? তোমার প্ররোচনায় যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করবার জন্য রামপ্রসাদকে অনুরোধ করেছিলাম, তা আজ আমায় উপহার দেবার জন্য সুদূর হালি-শহর থেকে এসেছে। আর সে কাব্যগ্রন্থের বিচারের ভার তোমার উপর দেব বলে আমি মনস্থিরও করে ফেলেছি।

সবিস্ময়ে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বললেন, আমার প্ররোচনায় কাব্যগ্রন্থ রচনা করে দেবার আদেশ করেছিলেন? কিন্তু কি সেই কাব্যগ্রন্থ?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—'বিদ্যাসুন্দর'।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে এবার রায়গুণাকরকে মাথা আনত করতে হয়। কারণ, বিদ্যাসুন্দর নামটি শুনে তাঁর পূর্বের সমস্ত কিছুই স্মরণ হয়ে যায়! তবে হাঁ। তাঁরই কূটবুদ্ধির ফলেই মহারাজ আদেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ সে আদেশ যে ফলবতী হবে এ ধারণা তাঁর আদৌ ছিল না। তাই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

যখন রায়গুণাকর এমনি নানা কথা নিজের মনে ভাবতে থাকেন, ঠিক তেমনি সময় আত্মভোলা রামপ্রসাদ আপন খেয়ালে মাতৃনাম গান করতে করতে রাজসভায় প্রবেশ করেন, 'এমন দিন কি হবে তারা! যবে তারা তারা তারা বলে বেয়ে পড়বে ধারা॥'

গাইতে গাইতে রামপ্রসাদ রাজসভায় প্রবেশ করলেন। বগলের নিচে তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যগ্রন্থখানি! সভায় প্রবেশ করে একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তারপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, মহারাজা আপনার আদেশ ও মহামায়া মহাশক্তির ইচ্ছায় যে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছি, মহারাজের করে তা অর্পণ করে বিদায় প্রার্থনা করবো। বলেই রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে অর্পণ করলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সাদরে তা গ্রহণ করে বললেন, জানতাম রামপ্রসাদ! আমি তোমাকে যে কাব্য রচনা করে দেবার জন্য আদেশ করেছিলাম, তা মহামায়া মহাশক্তি তোমায় দিয়ে রচনা করাবেন!

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে রামপ্রসাদ প্রশান্ত স্বরে বললেন, মহারাজ আপনার কথাই সত্য। কারণ মহামায়া মহাশক্তির ইচ্ছা ভিন্ন কোন কাজও সমাধান করবার মতন শক্তি মনুষ্য সমাজে কারো নেই,। আর মা-ই যা করিয়েছেন, যা লিখিয়েছেন, তা আপনার করে অর্পণ করে, আপনার কাছে মুক্তি কামনা করছি।

না রামপ্রসাদ না, আজই তোমাকে মুক্তি দিতে পারি না—বললেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর একটুখানি নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন, আজ তুমি আমায় যে বিদ্যাসুন্দর কাব্য অর্পন করেছ, তা বিচারের জন্ম আমার সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের হাতে দেবো।

রামপ্রসাদ বললেন, মহারাজের যা ইচ্ছা তাই করবেন। এতে আমার বলবার কিছু নেই।

রামপ্রসাদের কথা শেষ হ'তেই এবার রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বললেন, মহারাজ, আপনার এই উক্তিটা বুঝি যুক্তিসংগত হয়নি। কারণ এতে রামপ্রসাদের ইচ্ছা নাও থাকতে পারে।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কথা শুনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন, রায়গুণাকর, তোমার মুখ থেকে এমন উক্তি আমি প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু তোমার মন এতই কু-চক্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে আজ আমার সামনে এমন ব্যঙ্গ উক্তি করতে এতটুকু

দ্বিধা বোধ করনি। কিন্তু যাক্ সে কথা। রামপ্রসাদের এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। এর সূক্ষ্ম বিচার কার্য সমাধান করে, কল্য সভায় সকলের সামনে তা প্রকাশ করবে। এটাই আমার আদেশ। বলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যগ্রন্থখানি রায়গুণাকরের হাতে তুলে দিলেন। রামপ্রসাদ মুক্তানন্দে গেয়ে উঠলেন—

"ভূতের বেগার খাটবো কত ;
তারা, বল আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক, হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা, ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অনুগত ॥
আসিয়া ভব-সংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা, যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত।
চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচ্‌লো না সে মুখের তিত।
কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ, হয়ে কালার শরণাগত ॥"

বিদ্যাসুন্দর কাব্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেই তাঁর কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন রামপ্রসাদ।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, না রামপ্রসাদ। আজ তোমায় কিছুতেই বিদায় দিতে পারি না। অন্ততঃ আর একটা দিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

মহারাজের এই বাধাদানে সাধক কবি বললেন, মহারাজ, এই পঞ্চভূতের দেহকে কেন আর মায়ার বন্ধনে বাঁধতে চান।

—না রামপ্রসাদ। তোমাকে বাঁধবার মত শক্তি আমার নেই। তাই তোমায় শুধু অনুরোধ করছি, বললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদ, তোমার কণ্ঠের মাতৃনাম গান শুনে পঞ্চভূত ষড়রিপুর দেহটাকে একটু মুক্তালোকের দিকে যদি নিয়ে যেতে পারি এই আশায়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এ কথায় সাধক কবি আর দ্বিতীয় কোন বাক্য ব্যয় না করে, আত্মসমাহিতভাবে গেয়ে উঠলেন—

"এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভাবীকে ভাল ভুলিয়েছি
তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি।
তারানাম সারাৎসার, আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ করেছি॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা ক'রে ব'সে আছি

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার দ্বিতীয় দিন।

পূর্ব দিনের মতন সভা সু-নীপুণ ভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। সজ্জিত করা হয়েছে ন্যায় ও সত্যের প্রতীকরূপে। হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ, আর স্বার্থ-লোভ কামনা-বাসনা থেকে প্রতি জীবের মনকে মুক্ত করবার জন্য, সংহাররূপিনী মহাশক্তি কালীকারূপ আর বুদ্ধি-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাগ্‌দেবীর প্রতিরূপকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

রাখা হয়েছে 'অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকারে' জ্ঞানের শলাকে প্রজ্বলিত করে তোলবার জন্য। যেন—ন্যায় আর সত্য এই দুই শক্তি এসে দাঁড়িয়েছে; প্রতিটি সংসারী জীবদের বুঝিয়ে দেবার জন্য, ন্যায় ও সত্যের কাছে অন্যায় অসত্যের কোন স্থান হবে না।

ধূপ-ধুনো-চন্দন-সুগন্ধ পুষ্পে, সুমিষ্ট গন্ধে, সমস্ত রাজসভায় পরি-পূর্ণতার রূপ নিয়ে, সব কিছু মলিনতাকে ভাসিয়ে নিয়ে শুভ্রতার ও আনন্দের প্রাণ বন্যা বইয়ে দেবার জন্য এই আয়োজন করিয়েছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

মহারাজের এই অপূর্ব আয়োজনে মন্ত্রী উপমন্ত্রী আর রাজ দরবারের সকল সভাসদেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন

কৌতূহলী দর্শকেরা। তা'ছাড়া মহারাজের আদেশে ভাটেরা দেব বন্দনা, সভাপণ্ডিতেরা বেদ পাঠ ও মহাশক্তি মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে চলেছেন। চারণ কবির দল মাতৃনাম গান করতে করতে সমস্ত কৃষ্ণনগর শহরটি পরিভ্রমণ করছেন।

সমস্ত কৃষ্ণনগরটিকে এক অপূর্ব প্রেমময় রাজ্যে পরিণত করে সকলের মনের মধ্যে প্রেম-ভক্তির বন্যা বইয়ে দিয়ে চলেছেন। ঠিক সেই সময়ে ঘোষক ঘোষণা করলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আগমন বার্তা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাধক কবি রামপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন, একটা পরিপূর্ণতার ভাব নিয়ে।

মহারাজ সভায় প্রবেশ করতেই সভাসদেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। সভাপণ্ডিত বেদ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি বচনে মহারাজের মঙ্গল কামনা করে দেবী মহামাযা মহাশক্তির স্তুতি করতে লাগলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় আসন গ্রহণ করে, রামপ্রসাদকে তাঁর পাশের আসনে উপবেশন করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তাঁর এই অনুরোধকে অবহেলা করে বললেন, না, মহারাজ! আপনার এই অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না। কারণ রজত আসন অপেক্ষা আমার মায়ের মৃণ্ময় আসন অনেক শ্রেয়।

রামপ্রসাদের বিনীত কণ্ঠস্বরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও সভাসদেরা একই সঙ্গে সাধুবাদ দিয়ে উঠলেন। তারপর প্রশান্ত স্বরে বললেন, সার্থক রামপ্রসাদ। সার্থক তোমার জীবন! তুমিই প্রথম বুঝলে রজত আসন অপেক্ষা এই মৃন্ময়াসন অনেক শ্রেষ্ঠ। বলেই মহারাজা একবার সাধক কবি রামপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, রায়গুণাকর এখনো এলো না, তার কারণটা কি?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে সভাসদদের মধ্যে একজন বললে, হয়তো কোন কাজে আটকে পড়েছেন। আমরা এখনই তাঁর কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছি।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, হয়তো রায়গুণাকর অল্পক্ষণের মধ্যে এসে যাবে। বলেই মহারাজা এক বার সাধককবি রামপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, রামপ্রসাদ সভার কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে তুমি একটা মাতৃনাম গান কর! মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই আবেদন শুনে রামপ্রসাদ নিমেষের জন্য একবার তাকালেন মহারাজের মুখের দিকে। আর একটি বার তাকালেন সভাসদ এবং অন্য সকলের দিকে। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আত্মসমাহিত ভাবে গাইতে লাগলে—

"ইথে কি আর আপদ আছে।
এই যে তারার জমি আমার দেহমাঝে।
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥
ধৈর্যখুঁটা, ধর্মবেড়া, এদেহে চৌদিক ঘিরেছে।
এখন কাল চোরে কি করতে পারে, মহাকাল রক্ষক হয়েছে॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হ'তে বাহির হয়েছে।
কালীনাম-অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে, পাপতৃণ সব কেটেছে॥
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
প্রসাদ বলে কালীবৃক্ষে, চতুর্বর্গ ফল ধরেছে॥"

রামপ্রসাদের মাতৃনাম গান শেষ হতেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সভায় প্রবেশ করেই বলে উঠলেন, মহারাজের জয় হউক।

রায়গুণাকর ভরতচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রশান্ত দৃষ্টি তুলে তাকালেন রায়গুণাকরের মুখের দিকে। তাকালেন রাজসভার আর সকল সভাসদেরা।

তাকিয়ে সকলে দেখলেন, একটা প্রদীপ্ত জ্যোতি মুখে ফুটিয়ে রেখে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অভিবাদন জানিয়ে স্ব-আসন গ্রহণ করে বললেন, মহারাজ! জানি আপনারা সকলেই আমার আসার অপেক্ষায় ব্যস্ত হয়ে আছেন। আর প্রতীক্ষা করে আছেন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিচারের ফলাফল জানবার জন্য। বলেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য নীরব হয়ে রইলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, রায়গুণাকর তুমি বিচক্ষণ, তাই সকলের মনোভাব বুঝতে পেরেছ। এখন, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিচারের ফলাফল নির্দেশ করে, সকলের প্রতীক্ষার অবসান কর।

—মহারাজ! সকলকে শান্তি বিনোদন করবার মতন আমার শক্তিই বা কোথায়, একমাত্র মহামায়া মহাশক্তির কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, যে অন্ধ সে চাক্ষুষ্মান্ হতে পারে। তাই বলছিলাম মহারাজ আমার মতন অন্ধ-দাম্ভিক কবিকে, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য চাক্ষুষ্মান ও দাম্ভিকহীন করেছে। শুধু দাম্ভিকতা হরণ করা নয় মহারাজ, বাংলার তথা ভারতের সমগ্র কবিকুলেব মনোরঞ্জনকারী সাধক কবি রামপ্রসাদ! তাই মহারাজের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই—সাধক কবিকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান করে তাঁকে সম্মানিত করুন। কারণ যিনি কবিকুলের মনোরঞ্জন করতে পারেন তিনিই একমাত্র এই উপাধি পাবার যোগ্য!

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের এই উক্তি শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাধুবাদ দিয়ে বললেন, রায়গুণাকর তোমার ন্যায়বিচার, আর সূক্ষ্ম দূরদর্শিতার জন্য বার বার সাধুবাদ দিয়ে, তোমাকে ছোট করতে চাই না। তাই তোমার অনুরোধে আজ রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করলাম। বলেই রামপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, রামপ্রসাদ! যার জন্য তোমার সাধনায় আমি বিঘ্ন ঘটাতে বাধ্য হয়েছি, সে জন্য মনে অপরাধ নিয়ো না। যাও! আজ থেকে তুমি স্বাধীন ও মুক্তভাবে মাতৃ সাধনা ও নামগানে সমগ্র দেশকে জাগিয়ে তোল। আর অন্ধ কলির জীবদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করে তোল।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় প্রশান্ত স্বরে রামপ্রসাদ বললেন, মহারাজা জগন্মাতা যা ইচ্ছা করবেন, তাই সম্ভব হবে।

তাই হোক রামপ্রসাদ। মহামায়া মহাশক্তি যা করবেন তাই হবে, তবে আজ তোমার যাবার বেলায় আর একবার মাতৃনাম গান শুনিয়ে যাও। অনুরোধ করলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই অনুরোধে রামপ্রসাদ কোন কথা না বলে শুধু আপন ভাবে বিভোর হয়ে গেয়ে উঠলেন—

মা, বসন পর।

বসন পর, বসন পর, মাগো! বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চিত জবা, পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী গোকুলে গোপিনী গো॥
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মাগো, কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো, বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধিরধারা, মাগো, গলে মুণ্ডমালা।
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো, ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে।
ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥

গাইতে গাইতে রামপ্রসাদ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর তার সভাসদ ও পারিষদেরা সকলেই যেন কেমন মুহ্যমান হয়ে তাকিয়ে থাকেন সাধক কবির দিকে।

॥ ৩১ ॥

রামপ্রসাদ কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন তাঁর সাধনার তীর্থক্ষেত্র হালিশহরে।

যেখানে আশৈশব বর্দ্ধিত হয়ে ও মাতৃনাম গানে যে জন্মভূমিকে পুণ্য তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত করে তুলেছেন, সেই পুণ্যভূমিতে ফিরে এসেই নিজের জীবন মনকে একেবারে সঁপে দিলেন কঠিন সাধনার মধ্যে।

রামপ্রসাদ সংযত করলেন নিজের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে।

তার ফলে বাহ্যিক সমস্ত কিছুকেই পশ্চাতে ফেলে রেখে তিনি শুধু আকুল আবেদন জানান—

"মন রে! এই মিনতি করি তোরে
সদা যেন, মতি থাকে মায়ের চরণ পাবার আশে।"

এই আকুল আবেদন, আর মনের দৃঢ়তাকে সম্বল করে কঠিন থেকে কঠিনতম সাধনায় নিমগ্ন হয়ে রইলেন রামপ্রসাদ।

নিমগ্ন হয়ে রইলেন, স্বহস্তে তৈরী পঞ্চমুণ্ডী আসনে।

দিনের পর রাত, আর রাতের পর দিন। এমনি করে রামপ্রসাদের জীবন বয়ে যেতে থাকে। আর তারই সঙ্গে তাঁর দেহেরও পরিবর্তন হতে থাকে। শুধু যে দৈহিক পরিবর্তন তা নয়, মনেরও যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে তাও সময় সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কখনো হাসিতে, কখনো আকুল কান্নায় আবার কখনো কখনো আকুল কণ্ঠের মা মা ডাকে।

আবার কখনো বা মায়ের নামগানে আকুল হয়ে ওঠেন—

"আমার মনের বাসনা জননী।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ, ল, ক্ষ ব্রহ্মরূপিনী।"

'এমনি ভাবে রামপ্রসাদ সাধনার মধ্যে এগিয়ে চললেন।

তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়ে উঠতে থাকে মাতৃ রূপের অপূর্ব বিভূতি।

কুলকুণ্ডলিনী রূপ।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মাতৃ সাধনার ক্ষেত্রে প্রতি সাধকের পক্ষে জাগরিত করা প্রয়োজন হয়ে থাকে। রামপ্রসাদ সেই তন্ত্র সাধনার গভীর হতে গভীরতার মধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেন। এগিয়ে চলেন

সিদ্ধি লাভের পথের দিকে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহের মধ্যে প্রকাশ হতে থাকে একটা উজ্জ্বল দ্যুতি। আর যতই এই দেহের দ্যুতি প্রকাশ হতে থাকে ততই যেন তাঁর মন মায়া মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এবং যখনই দেহের আনুসঙ্গিক সব কিছুই মুক্ত হয়ে যায়, তখনই মায়ের পূর্ণ বিকাশ দর্শন করতে থাকেন।

এমনি ভাবে আরো কিছুকাল কঠিন কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থেকে কুলকুণ্ডলিনী মহা শক্তিকে জাগ্রত করে রামপ্রসাদ সিদ্ধি লাভ করলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেই তাঁর দু'নয়ন মুক্ত করে একবার তাকালেন 'প্রকৃতি মায়ের' দিকে, তাকালেন মুক্ত নীলাকাশের দিকে। তারপর আপন খেয়ালে গেয়ে উঠলেন—

"আমাব মনের বাসনা জননী।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ, ল, ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথ্বী ব, স অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী
সার্ধ ত্রিবলয়াকারে শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল অন্তে ষড়্‌দলোপরবাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব, ভৈরবী ডাকিনী॥
ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নিবীজধারিণী।
ড, ফ অন্তে দ্বিদলে, শিব ভৈরবী লাকিনী॥
অনাহতে ষট্ কোণে দ্বিষড়্‌দলবাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্রযোনি।
চন্দ্র বীজে সুধাক্ষরে হ, ক্ষ বর্ণে হাকিনী॥"

॥ ৩২ ॥

সাধনায় পূর্ণ-সিদ্ধি লাভের পর।

রামপ্রসাদ নিজের জীবন-মনকে আরো গভীর ভাবে মাতৃনামের মধ্যে মাতিয়ে রাখলেন।

জাগিয়ে তুলতে লাগলেন সমস্ত হালিশহর ও কুমারহট্টের গ্রামবাসীদের হৃদয়ের মধ্যে একটা অনাবিল ভক্তি-প্রেমের নিষ্কলঙ্ক ফল্গুধারা।

আশা-আকাঙ্ক্ষাহীন, ঐহিক বাসনাহীন ভাবে, সকলের হৃদয়ের মাঝে বইয়ে দিতে লাগলেন—এই ভব সংসারে কেউ কারো নয়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এরা কি তোমার? একমাত্র জগন্মাতাই সার। শুধু সার নয় 'সারাৎ সার'।

এই ব্রহ্মরূপিনী মা-ই, একমাত্র মুক্তির আধার। কেননা এই ভব সংসারে মা ভিন্ন কারো গতি নেই। 'কলির' করাল হাত থেকে ভব জীবনকে মুক্ত করতে চাইলে মায়ের শ্রীচরণ ধর। তা'ছাড়া মা-ই যে জগতের মধ্যে সর্বভূতা সনাতনী!

কালী বল, কৃষ্ণ বল, সবই ত মায়ের বিভূতি মাত্র। তাই সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

"কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবরবেশে বৃন্দাবনে।

পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী, এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারী॥

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস এবে মৃদু হাস,

ভুলে ব্রজকুমারী।

পূর্বে-শোণিত-সাগরে নেচেছিল শ্যামা,

এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি।

মহাকাল কানু, শ্যাম-শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি ॥"

সাধক কবি রামপ্রসাদ যখন এমনি ভাবে স্বদেশের প্রতিটি নর-নারীর হৃদয়ের মাঝে ভক্তি-প্রেমের ঝর্ণাধারা বইয়ে দিয়ে চলেছেন, তেমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সংবাদ পেলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্তিম শয্যায় শায়িত হয়েছেন। এবং আরো শুনলেন যে, তাঁর এই অন্তিম কালে একবার সাধক কবির দর্শন লাভের জন্য বড়ই উতলা হয়েছেন।

কথাটা শুনেই রামপ্রসাদের সমস্ত অন্তরটা আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। আর আকুলি-বিকুলি করবেই না বা কেন? যিনি ধার্মিক ও দানশীল বলে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন, যিনি স্বীয় প্রজাদের আপন সন্তান বলে মনে করেন, আর ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ ভাবে বিচার করেন, তাঁর জন্য যে স্বয়ং জগন্মাতাই উতলা হয়ে ওঠেন।

কেন না, তাঁর শত সহস্র সৃষ্টির মাঝে এমন কয়েক জনকে ন্যায়, সত্যনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ করে সৃষ্টি করে সনাতন মাতৃধর্মকে রক্ষা করবার জন্য পাঠিয়ে থাকেন। তাই ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকেও বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও ন্যায়-নিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণ করে পাঠিয়েছিলেন।

তাই ত রামপ্রসাদ সংবাদটি শোনার পরই জগন্মাতাকে স্মরণ করে যাত্রা করলেন, জহর জহুরীকে দেখবার জন্য।

সুদীর্ঘ পথে এগিয়ে চলেছেন রামপ্রসাদ। কণ্ঠে একমাত্র অভয়ার নামগান।

এমনি ভাবে মাতৃ নামগান করতে করতে যখন এগিয়ে চলেছেন, তেমনি সময় শুনতে পেলেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজভবনের পরিবর্তে নদীয়ার রাজভবনে আছেন।

কথাটা শুনেই রামপ্রসাদ তাঁর পথ পরিবর্তন করে দ্রুত এগিয়ে চললেন নদীয়ার দিকে। এবং এইভাবে দ্রুত পথ চলার ফলেই দু'তিন দিনের মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। কণ্ঠে শুধু মাতৃ নামগান—

"এমন দিন কি হবে তারা!

যবে তারা তারা তারা বলে বেয়ে পড়বে ধারা ॥"

রামপ্রসাদের মাতৃ নামগান শুনে অন্তিম শয্যায় শায়িত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার অনুচরদের আদেশ করলেন সাধক কবিকে সাদরে নিয়ে যাবার জন্য।

রামপ্রসাদ ভাবাবিষ্ট ভাবে নিজে ছুটে চললেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সকাশে। এসে দাঁড়ালেন মহারাজের শয্যার পাশে। যেন—জহর এসে দাঁড়াল জহুরীর পাশে।

প্রশান্ত হাসিতে মহারাজের মুখ মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তার পর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, রামপ্রসাদ, তুমি যে আসবে আমি জানতাম। তাই তোমারই জন্য আমার এই অন্তিম প্রতীক্ষা। বলেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটুখানি নীরব থেকে আবার তেমনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, রামপ্রসাদ এইমাত্র তুমি যে মাতৃনাম গানটি করছিলে সেটি আর একবার শোনাও, যাবার বেলায় শুনে যাই।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে রামপ্রসাদের দু'নয়ন থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। তিনি গেয়ে উঠলেন—

এমন দিন কি হবে তারা।

যবে তারা তারা তারা বলে, বেয়ে পড়বে ধারা ॥

হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,

তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা ॥

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥

শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে,

ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা ॥

রাম প্রসাদের কণ্ঠে মাতৃনাম গান শুনতে শুনতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দু'নয়ন বন্ধ হয়ে যায়। শুধু দু'ফোঁটা অশ্রু ধারা দু'পাশে গড়িয়ে পড়ে।

আর রামপ্রসাদ উদাস দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন মহারাজের মুখের দিকে। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বন্ধ আঁখি যুগল আর এক লহমার জন্যও খুললেন না। রামপ্রসাদের মাতৃনাম গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের প্রাণবায়ু মাতৃপদে লীন হয়ে যায়।

॥ ৩৩ ॥

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেহাবসানের পর থেকেই সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। সদানন্দময় রামপ্রসাদ, আত্মভোলা রামপ্রসাদ যেন কোন এক গভীর চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

নিয়তীর এই বৈচিত্র্যময় খেলাঘরে জহুরী জহর কে হারিয়ে যে রূপ ধারণ করে তেমনি ধারা রামপ্রসাদের জীবন দর্শনে সকলেই প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। কিন্তু কেহ সাহস করে তাঁর এই ভাবনার জালকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে কোন কথা জিজ্ঞাস করতে সাহসী হলেন না

তাছাড়া মহারাজের দেহাবসানের পর মুহূর্ত থেকেই ত সকলেই শোকে অভিভূত হয়ে রয়েছেন।

সমগ্র নদীয়ায় তথা কৃষ্ণনগরেও একটা হাহাকার ভিন্ন আর কিছুই নেই। চারণ কবিদের কণ্ঠে রাজগাথার পরিবর্তে এখন শোক গাথা প্রকাশমান হয়ে সকলের মনকে দ্রবীভূত করে চলেছ—এই সব কিছুকেই মিলিয়ে সমস্ত নদীয়ায় এমন এক পরিবেশ রচিত হয়েছে যে তা' ভাষাও ব্যক্ত করা যায় না। যাঁরা সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্য সম্যক প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরাই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারেন।

এমনি এক মর্মস্পর্শ
অবস্থান করে সাধক কবি রামপ্রসাদ ফিরে এলেন নদীয়া থেকে আপন জন্মভূমি হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রামে। ফিরে এলেন আপনার পীঠ ক্ষেত্রে।

ফিরে এসেই রামপ্রসাদ আপনার সাধনাতেই জীবন মনকে নিয়োজিত করে রাখলেন।

শুধু নিয়োজিত নয়; সমস্ত জীবন-মন দিয়ে আকুল হয়ে মা'কে ডাকতে লাগলেন, মা! মাগো! এই ভবের হাটে খেলাতে গিয়ে কি মা সবই অসম্পূর্ণ করে রাখবি মা। আবার কখনো বা আত্ম-সমাহিত ভাবে গেয়ে ওঠেন—

"থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥
তাদের দমন করবো কি মা! ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি সরে'।
প্রসাদ বলে কোন্ বেচালে তারাই পাছে কয়েদ করে॥"

গাইতে গাইতে সাধক কবি আত্মসমাধিস্থ হয়ে যান। যেন কোন এক অলৌকিক রাজ্যের মধ্যে বিচরণ করতে থাকেন। লীলা খেলা খেলতে থাকেন জগন্মাতা মহামায়া মহাশক্তির সঙ্গে।

॥ ৩৪ ॥

তখন ভাদ্রের শেষ হয়ে গেছে।

আশ্বিনের প্রথম দিবসেই জেগে উঠেছে আগমনীর আগমন বার্তা। দিকে দিকে জেগে ওঠে আনন্দের কল-কোলাহল। শরতের আকাশ-

শিউলীর মধুর গন্ধ সকলের হৃদয়-মনকে যেন মাতোয়ারা করে তুলেছে।

সকলেরই কণ্ঠে একটি সুর, 'মা আসছেন। মা আসছেন। দশভুজা রূপে। দশদিকে দশটি হাত প্রসারিত করে দিয়ে, মা আস্‌ছেন।'

সঙ্গে ভাগ্যরূপিনী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণেশ আর বলদর্পি কার্ত্তিকেয়কে নিয়ে।

সকলের মনের মধ্যে বইছে আনন্দের জোয়ার। রাখালের বাঁশের বাঁশরীতে জেগে ওঠে সেই আগমনী সুর। সেই আগমনীর আগম সুর সাধক কবি রামপ্রসাদের হৃদয়ে এসে যেন দোলা দিয়ে গেল। সমাধি ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে তাকালেন শরতের নির্মল আকাশের দিকে। অন্তরের মাঝে জেগে উঠল আগমনীর আগমন সুর আপন ভাবের ঘোরে গেয়ে উঠলেন—

"আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে॥
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে।
শুনিয়া এ শুভবাণী, এলোচুলে ধায় রানী, বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে॥
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥"

আগমনীর আগমন গান গাইতে গাইতে সাধক কবি যেন আত্মহারা হয়ে পড়েন। গিরীজায়ার অন্তরের আকুলতায় যেন মূর্ত হয়ে উঠে, হালিশহরের আকাশ বাতাসকে কেমন মথিত করে তুলছে। মথিত করে তুলছে সাধকের কণ্ঠের আগমনী গানে।

আত্মহারা রামপ্রসাদ আত্মসমাহিত ভাবে তখনো গেয়ে চলেছেন 'উমা' মায়ের আগমন গান—

"যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত-মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লসিত জগজ্জনে,
দিবা নিশি নাহি জানে, আনন্দ পাসরে ॥

মহাসপ্তমী তিথি এসে চলে যাবার আয়োজন করে। কিন্তু রামপ্রসাদ আত্মসমাহিত ভাবে বসে থাকেন 'পঞ্চমুণ্ডীর' আসনে। আগত প্রায় মহাঅষ্টমী ও নবমী পূজা শেষ হয়ে যাবে। তারপর মহামায়ার বিদায়ের সুর জেগে উঠবে সানাইয়ের সুরে। তারপর নয়নের জলে, মা দশভূজাকে আবার একটি বছরের জন্য বিদায় দিতে হবে।

একটা ভাবের আবেগে, সাধকের দু'নয়ন থেকে অবিরল ধারা বইতে থাকে।

যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরাখ বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে, একি কথা মরি গো ॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জন, সকরুণে ভনে,
এমন শুভ দিন আর কার গো ॥"

এমনি আত্মসমাহিতভাবে গাইতে গাইতে সাধকের জীবনের উপর দিয়ে কেটে যায়, মহা-অষ্টমী তিথি আর মহা-নবমী তিথী।

তারপর—বিজয়ার বিদায় গানে তাঁর অন্তর মূর্ত হতে সাধক কবি রামপ্রসাদ, আকুল কণ্ঠে বিজয়ার বিদায়ের গান গাইতে থাকেন—

"ওরে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার ॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদায় ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়ে না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরানী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥"

মহাবিজয়ার গান গাইতে গাইতে রামপ্রসাদের দু'নয়ন থেকে অবিরল ধারা গাড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর সমস্ত দেহ-মন যেন ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে।

তাই একটা আকুল ভাবাবেগের মধ্যে, ওই দূরনীলিমার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গভীর ভাব সমাধির মধ্যে ডুব দিলেন। ডুব দিলেন তারা মা, তারা মা বলে।

॥ ৩৫ ॥

মহাকালের চক্র আপনা আপনি ঘুরে চলেছে।...

এই চক্রের আবর্তনের মাঝে কত যোগী-ঋষি, সাধক-সন্তদের জীবনে লীলা খেলা সাঙ্গ করে চলে যেতে হয়। কত গৃহী, সংসারী, ভোগী, পাপী-তাপিদের বিপাকে পড়ে হাবু ডুবু খেতে হয়, তার হিসেব নিকেশ পাওয়া ভার।

মহাকাল তখন কালরূপী হয়ে বিনাশ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই বিনাশ যজ্ঞের আহুতী হয়ে দাঁড়ায় অনেকেই। শত সহস্র নীচঃ বিনাশায়ঃ।

এই শত সহস্র বিনাশের মধ্যেও শিব সত্য, সত্য শিব হয়ে দাঁড়ায়। আর শিবকে অবলম্বন করে, একমাত্র মহামায়া মহাকালীর ধ্যান

াধনায় ডুবে থাকতে পারেন যিনি, তিনিই একমাত্র 'তারা ব্রহ্মময়ী' ়পের দর্শন লাভ করবার অধিকারী হয়ে থাকেন।

আশ্বিনের দুর্গা পূজার বিজয়ার পর মুহূর্ত থেকেই সাধক রাম-প্রসাদ নিজের জীবন মনকে একেবারে সঁপে দিলেন, মাতৃনাম গানের ধ্যে আর সাধনায়। যেন জীবন নাট্যের শেষ সম্বল করে নিলেন, দেবী মহামায়ার নাম আর নামগানকে।

এই ধ্যান সাধনায় আর মাতৃনামামৃত গানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে ায় আশ্বিন মাস। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবস থেকে জেগে ওঠে হাশক্তি, মহাকালীর আগমন বার্তা। সেই আগমন বার্তায় যেন সমস্ত ালিশহর আর কুমারহট্ট গ্রামে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। তার আর একটি বিশেষ কারণ আছে।

এই হালিশহর আর কুমারহট্ট হচ্ছে শক্তি সাধনার একটা পীঠস্থান। মস্ত হালিশহরে আর কুমারহট্ট গ্রামে মহাধুম পড়ে গেছে। ধুম ড়ে গেছে মহামায়া মহাশক্তি শ্যামামায়ের প্রাক্ পূজার আগমন ার্তায়। তাই সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মায়ের পূজার আয়োজনে। ার সাধক কবি রামপ্রসাদ ?

সাধক কবি রামপ্রসাদ আপন ভাবে গেয়ে চলেন মাতৃনাম গান—

"হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ওমা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী॥
আবির রুধির তার, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী॥

কুমারহট্ট গ্রাম বাসীরা এসে একদিন রামপ্রসাদকে বললেন, বাবা আপনাকে মায়ের পূজার দিন নামগান করতে হবে। কোন ওজর আমরা শুনবো না কিন্তু।

গ্রামবাসীদের কথা শুনে সাধক রামপ্রসাদ একটু হাস্‌লেন। তারপর হেসে বললেন, হঠাৎ তোমরা আমায় কেন এই অনুরোধ করছ বাবারা? আমার মতন এক পাগলের মাতৃনাম গান কি তোমাদের ভাল লাগবে?

যাঁরা সাধক কবি রামপ্রসাদকে অনুরোধ করতে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই এক সঙ্গেই বলে উঠলেন, আপনার মতন সাধকের গান যদি ভাল না লাগে, তবে আর কারো গান ভাল লাগবে না।

তাদের কথা শুনে সাধক কবি প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন, বাবাদের কথা আমি রাখতে পারি যদি আমার একটা অনুরোধ রাখ।

গাঁয়ের সকলে বললেন, আপনি যা বলবেন, আমরা তা রাখব। বলুন আপনার জন্য কি করতে হবে। তাঁদের কথা শুনে সাধক কবি রামপ্রসাদ ক্ষণকালেব জন্য নীরব থেকে, তারপর বললেন, যদি মায়ের বিসর্জনের দিন মাকে মাথায় করে বিসর্জন দেবার জন্য নিয়ে যেতে দেন—

সাধক কবির কথা শুনে সকলেই চমকিত হয়ে উঠলেন, চমকিত হয়ে উঠলেন তাঁরা এমন দৃঢ়তা দেখে! আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা বুঝতে পারলেন সাধক কবির এই অনুরোধের মধ্যে রয়েছে কোন গূঢ় রহস্য। যা তাঁদের কারো জানা নেই তাই তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা সাধক কবির এই অনুরোধে সম্মতি জানালেন।

তাঁদের এই সম্মতিতে, সানন্দে সাধক কবি রামপ্রসাদ বললেন, বেশ বাবা বেশ! আমার মায়ের পূজার আসরে, মায়েরই নামগান করবো। বলেই সাধক কবি ক্ষণকালের জন্য নীরব থেকে পুনশ্চ বললেন, জানত বাবারা, আমার মা যে বড়ই দুঃখী! কেউ তাঁকে ভাল ভাবে ডাকতে জানে না। বলেই তিনি উদাস ভাবে তাকিয়ে রইলেন ঐ সুদূর নীলিমার নীল আকাশের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি যেন দর্শন করতে লাগলেন মহামায়া মহাশক্তি তারা মায়ের অপরূপ রূপ মাধরী।

উন্মাদ হয়ে উঠলেন রামপ্রসাদ।

উন্মাদ হয়ে উঠলেন মায়ের অপরূপ রূপ মাধুরী দর্শন করতে করতে। একটা অজানিত ভাবাবেগে তিনি গেয়ে উঠলেন,—

"পতিতপাবনী পরা,
পরামৃতফলদায়িনী।
সুদিনে চরণছায়া, বিতর শঙ্কর-জায়া।
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তার-কারিণী ॥
কৃতপাপ হীনপুণ্য, বিষম ভজনাশূন্য।
তারারূপে তারয় মাং, নিখিল-জননী ॥
ত্রাণহেতু ভবার্নব, চরণ-তরণী তব।
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী ॥

সাধক কবি রামপ্রসাদের কণ্ঠের মাতৃনাম গানটি যেন মাতৃ বন্দনা রূপে প্রকাশিত হয়ে সকলের মনকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে তোলে।

॥ ৩৬ ॥

কাতিকের মাঝা মাঝি শ্যামাপূজার দিন ছিল।

মা দুর্গার পূজায় যেমন বাঙালীদের এক আনন্দ উৎসবের সাড়া পড়ে যায়, বাঙালীর ঘরে ঘরে তেমনি শ্যামা পূজার দিনেও দীপাবলীর উৎসবে আর এক আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।

সনাতন হিন্দু ধর্মে ও সংস্কৃতির মধ্যে চিরকাল বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে মহাশক্তি, মহামায়ার এই কালীকা রূপ। কারণ—

শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেছেন, মায়ের দশরূপের মধ্যে কালীকা রূপই অন্যতম। কেন না মায়ের এই কালিকা রূপে কালের 'কালো' হরণ করেন। কালকে মুক্ত করেন কালীকা রূপে। "কালিকাং দক্ষিণাং বিদ্যা, মুণ্ডমালা বিভূষিতাং!"

কুমারহট্টের গ্রামবাসীরা বেশ তোড় জোড় ভাবে শ্যামা মায়ের পূজার আয়োজন করে চলেছেন। তাঁদের কথা দেবার পর থেকেই,

মাতৃনামে একেবারে বিভোর হ'য়ে রয়েছেন রামপ্রসাদ, মা-ই যেন তাঁর অন্তরের ধন হয়ে রয়েছে।

শ্যামা মায়ের পূজার আর মাত্র দু'তিন দিন বাকী ছিল। রামপ্রসাদ সেই দু'তিন দিন পূর্বেই পূজা মণ্ডপে এসে উপস্থিত হলেন। কণ্ঠে মাতৃনাম গানই সম্বল করে রেখেছেন। অন্তরের আকুল মিনতি জানিয়ে চলেছেন জগন্মাতা তারা মায়ের কাছে। আবার কখনো বা মায়ের অপরূপ রূপ মাধুরীতে বিমোহিত হয়ে গেয়ে ওঠেন—

"কালী বল রসনা রে।

ও মন, ষট্‌চক্র-রথমধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥

তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।

পাঁচ ক্ষমতার সারথি তায়, রথ চালায় দেশদেশান্তরে ॥

জুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে।

সে যে সময় শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে ॥

তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে।

ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥

পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।

ও মন, এইত সময় মিছে কাল যায়,

(যত) ডাক্‌তে পার দু' অক্ষরে ॥"

পূজামণ্ডপের কর্মকর্তারা সাধক কবি রামপ্রসাদকে পূজার দু'তিন দিন পূর্ব থেকে পেয়ে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কেউ কেউ বা নানা দিক্ থেকে নানা ভাবে তাঁর সেবা করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, সাধক কবি রামপ্রসাদ সহাস্যে মধুর কণ্ঠে বললেন, বাবারা, তোমরা আমার সেবার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। একমাত্র জগন্মাতা শ্যামা মায়ের সেবা কর। তাঁকে আকুল হয়ে ডাক। এতে তোমাদের মঙ্গল হবে। সংসার জীবনে মুক্তির পথ দেখতে পাবে।

তাঁর কথায় কেউ কোন কিছু করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে সাহসী হলেন না। যিনি সংসারের মধ্যে বসবাস করেও সদা মুক্ত ভাবে মায়ের নামগান করে, মায়ের ধ্যান-স্তব স্তুতি করে, সংসার

ভোগীদের মন মুক্ত করবার জন্ম ব্যস্ত হয়ে থাকেন, তাঁকে সেবা ও যত্নের মোহ-বন্ধনে কি করে বাঁধবে। তাই তারা আর দ্বিতীয় কোন কথা না বলে শুধু অপেক্ষা করতে লাগল শ্যামা মায়ের পূজার।

আর সাধক কবি রামপ্রসাদ ?

সাধক কবি রামপ্রসাদ আপন ভাবে বিভোর হয়ে মায়ের নামগানে আর ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

আজ শ্যামা মায়ের পূজা।

তাই প্রতি ঘরে ঘরে শ্যামা মায়ের পূজার অর্ঘ্য আর দীপাবলীর আয়োজন চলেছে। পূজা মণ্ডপের কর্মকর্তারা এসে সাধক কবি রামপ্রসাদকে বললেন, আজ মায়ের পূজার দিন!

হাঁ বাবারা! আজ আমার শ্যামা মা এসেছেন, তাঁর সন্তানদের আনন্দ দিতে। বললেন সাধক কবি রামপ্রসাদ। তারপর ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, দেখ বাবারা, আমার মায়ের পূজাটা যাতে ভাল ভাবে হয় তার ব্যবস্থা করো।

সাধক কবি রামপ্রসাদের কথা শুনে, পূজার কর্মকর্তারা সহাস্যে বললে, —বাবা! আমরা তাই করছি। আপনার কথার অন্যথা করতে পারি না।

ইচ্ছাময়ী তারা মা যা করাবেন তাই সকলকেই করতে হবে। তার এতটুকু অন্যথা হবার উপায় নেই। বললেন সাধক কবি রামপ্রসাদ। এবং বলেই আপন ভাবের ঘোরে গেয়ে উঠলেন, ইচ্ছাময়ী তারা মাগো, তোমার কর্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি।

আজ শ্যামা মায়ের পূজা; তাই সকাল থেকে একটা আনন্দের সাড়া জাগিয়ে তুলেছে, হালিশহরে কুমারহট্ট গ্রামের ছেলে বুড়োর দল।

সকলের মনের মধ্যে ভক্তি আর ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়ে চলেছে ঢুলি আর তার দোয়ারিকেরা। পূজারী পণ্ডিতগণ দেবী মহামায়া মহাশক্তির বন্দনা আর স্তব পাঠ করে চলেছেন পূজামণ্ডপে মণ্ডপে।

আবার কেউ বা মার্কেণ্ডয় চণ্ডীর দেবী বন্দনা করে চলেছেন গুরুগম্ভীর স্বরে "যা' দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" বলে।

আর সাধক কবি রামপ্রসাদ সকাল থেকেই তাঁর সমাধির মধ্যে যেন ডুবে রইলেন। কখনো বা উদার উদাস স্বরে বলেন—মা! আমার শ্যামা মা! আবার কখনো ভাবের ঘোরে গেয়ে ওঠেন মায়ের নাম গান—

"ডাকরে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুল না মন সময়কালে॥
এসব ঐশ্বর্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ।
ওরে ও পদপঙ্কজে মজ, চতুর্বর্গ পাবে হেলে॥
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবে না ছাড়ায়ে যেতে, কাল-ফাঁসি লাগবে গলে॥"

সাধক কবি রামপ্রসাদের কণ্ঠে মাতৃনাম শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলে-বুড়োর দল। যেন হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ধারা ঢেলে দিয়ে সাধকের কণ্ঠের মাতৃনাম রসামৃত পান করতে থাকে।

তখন মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হয়ে গিয়ে, অপরাহ্নের ছায়া পড়তে শুরু করেছে। দীপ্ত দিবাকর তাঁর দীপ্ত তেজকে সংবরণ করে নিয়ে পশ্চিমাকাশে নামবার আয়োজন করে চলেছেন। আর অল্পক্ষণ পরেই গোধূলির ছায়া নেমে এলো সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর। তারপর গোধূলির ছায়াও এক সময় মিলিয়ে গিয়ে নেমে এলো সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর তমিস্রা রজনীর গাঢ় অন্ধকার। এবং এই অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠল প্রতি ঘরে ঘরে দীপাবলীর এক আলোর রোশনাই। মাতৃ পূজায় কর্মকর্তারা মায়ের ষোড়শ উপাচারে পূজার আয়োজন করে চলেন; এবং তা তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কারণ রাত্রি প্রথম প্রহরে দেবী চতুর্ভুজার পূজায় উপবেশন করতে হবে! তাই তারা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর সাধক কবি রামপ্রসাদ!

যতই রাত বাড়তে থাকে রামপ্রসাদ ততই তারা মায়ের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে। যেন ব্রহ্মময়ী তারা মায়ের চরণ তলে বসে আপনার মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে তুলছেন। অনন্ত বিশ্বের বিপুল কোলাহল

থেকে সমস্ত সত্তাকে অনাদি অনন্তে লীন করে দিয়েছেন। তেমনি এক শুভ-মাহেন্দ্র ক্ষণে সাধক কবি ভাবের আবেগে গেয়ে উঠলেন—

"তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদনভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এলেন কি না এলেন দেখি॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কিরে,
তবে তারা-নামের কবচমালা, বৃথা আমি গলায় রাখি॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাসতালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখনও বাকীর দায়ে না ঠেকি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব, আমি তাঁর অন্ত পাব কি॥"

ভাববেগে গাইতে গাইতে সাধক কবি রামপ্রসাদ যেন তন্ময় হয়ে যান। যেন তাঁরই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুদূত, সাধক কবিকে পরোয়ানা জানিয়ে দেবার জন্য।

প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও হে সাধক, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি। তাই তো সাধক কবি রামপ্রসাদ আকুল হয়ে ডাকেন মা, মা বলে। ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হয়ে আসে, পূজা মণ্ডপে পূজারী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন; মহা সন্ধিক্ষণে মহামায়া মহাশক্তি শ্যামা মায়ের পূজার আয়োজন করবার জন্য।

সাধক কবি রামপ্রসাদ তেমনি তন্ময় ভাবে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে আবার গেয়ে ওঠেন, ধীরস্থির হয়ে পূজামণ্ডপের কর্মকর্তা আর গাঁয়ের সকলে শোনেন সাধক কবির মাতৃনাম গান—

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি।
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ-পূণ্য, গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে॥

এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে।

সে যে সময় হ'লে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে ॥

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে।

যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥"

সাধক কবির কণ্ঠের মাতৃনাম গান শেষ হতেই পূজারী ওঁকার ধ্বনি দিয়ে শ্যামা মায়ের পূজার উপবেশ করেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠা আর আবাহন জানাতে গিয়ে যেন, পূজারী স্তব্ধ হয়ে যান। বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন, উচ্চারণ করতে পারেন না। ভুলে যান।

একি? একি দুর্দৈব ঘটনা!

তাঁর এতবড় জীবনে এমন অঘটন ঘটেনি! তবে আজ এমন হলো কেন? উন্মাদের মতন তাকায় পূজারী প্রতিমার দিকে। দু'টি নয়নের ধারা দু'গণ্ড বেয়ে নেমে আসে!

অশ্রুভরা নয়নে প্রতিমার দিকে তাকাতে দেখতে পেলেন, চতুর্ভূজা মা যেন খিল্ খিল্ করে হাসছেন।

অবাক্ কাণ্ড। মৃন্ময় পীঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হতেই, মৃন্ময় পীঠ-চিন্ময় হয়ে উঠেছে। এ কেমন করে সম্ভব হলো। ভেবে ঠিক করে উঠতে পারেন না। তাই নির্বাক হয়ে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাকিয়ে থাকেন পূজামণ্ডপের কর্মকর্তারা আর অন্যান্য সকলেই! ধীরে ধীরে রাত্রি আরো গভীর হয়ে চলেছে। পূজার উপাচার যেমনি ছিল, তেমনি পড়ে থাকতে দেখে একজন বৃদ্ধ বলে উঠলেন, ঠাকুর মশায় মায়ের পূজার আর বিলম্ব করবেন না, আপনি পূজা আরম্ভ করে দিন।

পূজারী বললেন, তা' কি করে সম্ভব হয়। মায়ের আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো না। তাঁর পূজা আরম্ভ করবো কি করে? পূজারীর কথা শুনে বৃদ্ধ একটুখানি হাসলেন; তারপর সাধক কবির গাওয়া মাতৃনাম গানের একটি কলি আওড়িয়ে বললেন—

"নয়ন থাকতে দেখিলি না রে মন, এমনি তোমার কপাল পোড়া।" বলেই বৃদ্ধ আবার বললেন, ঠাকুর মশায়! মায়ের পাগল ছেলে রামপ্রসাদ, আকুল ভক্তিতে তিনি মৃন্ময়ী পীঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করছেন,

সেখানে আবার কেন বেদমন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন! আপনি নির্বিঘ্নে মায়ের পূজা করে যান। যদি অন্যথা করেন, তবে জগৎ মাতা আপনার ভয়ানক ক্ষতি করে দিতে পারে। এমনকি—বলতে বলতে বৃদ্ধ থেমে যান!

বৃদ্ধ থেমে যেতেই পূজারী চকিতে একবার প্রতিমার দিকে তাকাতেই যেন তার চোখের ঠুলি খসে পড়ে গেল, তিনি যেন দেখতে পেলেন, মা যেন খিল্ খিল্ করে হাসছেন। আরও যেন মনে হলো মা তাকেই ডেকে বলছেন, দে দে আমায় খেতে দে, আমার পূজা কর।

পূজারী সানন্দে মায়ের পূজা করতে লাগলেন, সময় সময় যেন ভুলে যেতে লাগলেন মন্ত্র-তন্ত্র। শুধু নয়নের জলে ধুয়ে অর্ঘ্য তুলে দেন মায়ের পায়ে। আর মায়ের পায়ে দেওয়া সেই ফুলের অর্ঘ্যগুলি সমাধিস্থ রামপ্রসাদ যেখানে বসে আছেন, সেখানে এসে পড়তে থাকে।

পূজারী এই অদ্ভূত ঘটনা দেখে, মন্ত্র-তন্ত্র বিহীন ভাবে যত অর্ঘ্য মায়ের পায়ে দেন, ততই সেই অর্ঘ্যের ফুল রামপ্রসাদের কোলে মাথায় এসে পড়তে থাকে। এই অপূর্ব ঘটনা পূজামণ্ডপের কর্মকর্তারা আর অন্যান্য সকলে দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে বলে উঠলেন, মা এবার রাম-প্রসাদকে পূজা করে কোলে তুলে নেবেন। তাকে আর আমরা ধরে রাখতে পারব না।

মা পাগল ছেলে। এবার মায়ের কোলে স্থান নেবে! কিন্তু রামপ্রসাদ এর কিছুই জানতে পারেন না। যেন, সমাধিস্থ ভাবে, মায়ের সঙ্গে খেলা করে চলেছেন কখন বা তনয়া রূপে, আবার কখনও মাতৃরূপে।

আর অপরদিকে পূজারী আপন ভাবে মায়ের পায়ে অর্ঘ্যের পর অর্ঘ্যই দিয়ে যান। এমনি ভাবে মায়ের পূজা সমাপ্ত করে ভোগ নিবেদন করবার জন্য উঠে যান এবং আপন একটা অজানিত ভাবের ঘোরে ভোগ নিবেদন করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ভোরের পাখী শিষ দিয়ে উঠে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেয় আগামী সূর্যের প্রথম আলোর সংবাদ।

॥ ৩৭ ॥

প্রভাতী সূর্যের প্রথম আলোর সংবাদ জানিয়ে দেবার জন্য বিহগের দল কল-কোলাহল জাগিয়ে তুলে, মুক্তাকাশে উড়ে চলেছে। এমনি শুভক্ষণে সাধক কবি রামপ্রসাদ সমাধি ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে, তাকালেন পূজামণ্ডপের মৃন্ময়ী পীঠে চিন্ময়ী রূপের দিকে। ধীর স্থির অচঞ্চল, তাঁর নয়ন থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল আনন্দের মুক্তা ধরার মতন।

সাধক কবির এই হেন অচঞ্চল ভাবের দিকে তাকিয়ে পূজারী নীরবে মায়ের পাগল ছেলেকে, জ্ঞানদাত্রী পরম সত্যকে আকুল আবেগে প্রণাম জানালেন। আর প্রণাম জানালেন পূজামণ্ডপের কর্মকর্তারা ও বৃদ্ধরা।

কারণ তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, এবার জগন্মাতা তাঁর পাগল ছেলেকে দু'বাহু বাড়িয়ে 'কোলে' তুলে নেবেন।

সাধক কবির এসবের দিকে কোন হুঁস নেই, ধীরস্থির ভাবে ক্ষণ কাল মায়ের চিন্ময়ী রূপের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করবার জন্য চলে গেলেন।

চলে গেলেন কারো দিকে না তাকিয়ে একমাত্র তারানাম স্মরণ করতে করতে।

সাধক কবি রামপ্রসাদ চলে যেতেই পূজামণ্ডপের কর্মকর্তারা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে বললেন, আমাদের হালিশহরের দুর্ভাগ্য বোধ হয় ঘনিয়ে এসেছে। হয়তো মৃত্যুর করাল ছায়া সমগ্র হালিশহর আর কুমারহট্টের উপর ছড়িয়ে পড়তে পারে।

যখন তারা এমনি নানা আলোচনা করে চলেছে ঠিক তেমনি সময় সাধক কবি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে ফিরে এলেন। এবং ফিরে এসেই আবার তিনি যোগাসনে উপবেশন করলেন। এবং তারা নাম স্মরণ করতে করতে ভাব সমাধি ক্ষেত্রে ডুব দিলেন।

তখন বেলা অপরাহ্নের দিকে গড়িয়ে চলেছে।

উঠেছে। প্রতিমার বিসর্জনের পূর্বে বিদায় বরণ জানাতে দলে দলে এসে হাজির হলেন গ্রামের মেয়ে বৃদ্ধারা।

জগন্মাতাকে বিদায়ের বরণ পালা শেষ হলে, রামপ্রসাদ শ্যামা মাকে মাথায় তুলে নিলেন। ধীর অচঞ্চল সাধক কবি। কণ্ঠে তাঁর তারা ব্রহ্মময়ীর নাম।

ঢোল কাঁসর আর সানাইয়ের বেহাগ সুর জাগিয়ে তোলে বাদকেরা। মা চ'লে যাচ্ছেন, তারই বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে সকলের মনে! অথচ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হচ্ছে, জগন্মাতাকে বিসর্জনের বিদায় জানাবাব জন্য

সাধক কবি রামপ্রসাদ এগিয়ে চলেছেন শ্যামা মাকে মাথায় নিয়ে সকলের আগে আগে। চলেছেন আর সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ।

সাধক কবির কণ্ঠে অভয়ার নামগান।

উদার উদাস কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন রামপ্রসাদ।

কখনো গাইলেন, 'তিলেক দাঁড়া ওরে শমন বদন ভরে মাকে ডাকি।' তাবপব আবার গাইলেন, 'বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।'

মাতৃনাম গাইতে গাইতে যখন তাঁরই বসতবাড়ীর সামনে দিয়ে ভাগীরথীর দিকে এগিয়ে চলেছেন, ঠিক তেমনি সময় সর্বাণীদেবী একটা লাল পেড়ে শাড়ী পরে সীমন্তে সিঁদুরের রেখা টেনে আর ললাটে বড় করে সিঁদুরের টিপ দিয়ে বিসর্জনের শোভা যাত্রায় এসে যোগ দিলেন মূর্ত্তিময়ী দেবীর মতন।

সর্বাণী দেবীকে দেখে শোভাযাত্রাকারীরা চমকে উঠলেন। সসম্মানে তাঁকে পথ করে দিলেন। যাতে সাধক কবি রামপ্রসাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলতে পারেন সে ভাবে।

সাধক কবির কণ্ঠে মাতৃনাম গান তখনো থেমে যায়নি। তিনি গেয়ে চলেছেন—

কেবল আসার আসা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥

মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা! মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো॥
মা খেল্‌বে বলে ফাঁকি দিয়ে নামালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিলো॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হ'লো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥

গাইতে গাইতে সাধক কবি রামপ্রসাদ আর শোভা যাত্রীরা ভাগীরথীর তীরে সোপানাবলীর উপর এসে দাঁড়ালেন ক্ষণকালের জন্য। তারপর সাধক কবি একপা একপা করে নামতে লাগলেন, কণ্ঠে তাঁর মাতৃনাম গান তখনো থেমে যায়নি। তিনি গাইতে গাইতে নামতে লাগলেন আর সর্বাণী দেবীও তার অনুকরণ করে নামতে লাগলেন।

সাধক কবি আবার নামগান করতে করতে ভাগীরথীর বক্ষের উপর নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন অথৈ জলের দিকে—

"তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি ;
মাগো ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই :

গাইতে গাইতে সাধক কবি শ্যামা মাকে নিয়ে আকণ্ঠ জলে নেমে গেলেন। সর্বাণী দেবীও তাই করলেন।

রামপ্রসাদ মাতৃনাম গান গাইতে গাইতে শ্যামা মাকে নিয়ে অথৈ জলে ডুব দিলেন সর্বাণীদেবীও তথৈবচ। কিন্তু কেউ উঠলেন না। দুটি অমর আত্মা ভাগীরথীর অথৈ জলে মিলিয়ে গেল।

সানাইয়ে করুণ সুর উন্মাদ ভাবে বেজে চলেছে। শোভাযাত্রীরা উচ্চৈস্বরে তারা নাম করতে করতে ফিরে চললেন আপন আপন ঘরের দিকে বেদনা বিধুর হৃদয় মন নিয়ে।